Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারজানা আক্তার

রোলঃ 23100120094

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা।

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারজানা আক্তার

রোলঃ 23100120094

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা। " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারজানা আক্তার, আইডিঃ 23100120094 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা। ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মারজানা

(স্বাক্ষর)

মারজানা আক্তার

আইডিঃ 23100120094

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ইলমের পরিচয় 8

দ্বীনি ইলম অর্জন করা কেন ফরজ? 11

ইসলামে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব 13

কুরআনের আলোকে ইলমের মর্যাদা 18

হাদিসের আলোকে ইলমের মর্যাদা 23

নবী রাসূলগনের জীবনে ইলমের গুরুত্ব 26

সাহাবায়ে কেরামে ইলম চর্চা 29

আলেমদের সম্মান ও মর্যাদা 33

ইলম অর্জনে নিয়তের গুরুত্ব 38

ইলম অর্জনের আদব ও পদ্ধতি 42

ইলম অর্জনে ধৈর্য ও ত্যাগ 46

ইলম অর্জনের প্রতিবন্ধকতা ও তার সমাধান 49

তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধিতে ইলমের গুরুত্ব 52

ইলমে দ্বীনের ফযিলত ও প্রয়োজনীয়তা 57

ইলম অর্জনে দুনিয়া ও আখিরাতের ফযিলত 61

ব্যক্তি জীবনে ইলমের প্রয়োজনীয়তা 64

নারী ও শিশুদের ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা 72

ইলম হলো উত্তম জিহাদ 81

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানবজীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং সর্বশেষে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম দান করেছেন। এই দ্বীনকে যথাযথভাবে জানা, বোঝা ও বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইলম অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামে ইলমকে এমন মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, যা অন্য কোনো বিষয়ে খুব কমই দেখা যায়। কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত আয়াতেই আল্লাহ তাআলা পাঠ ও জ্ঞানের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন –

اقْرَأْبِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

("পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।)" (১)

দ্বীনি ইলম বলতে এমন জ্ঞানকে বোঝায়, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলাকে চিনতে পারে, ইসলামের বিধান সম্পর্কে অবগত হয় এবং নিজের জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। কুরআন, হাদিস, ফিকহ, আকিদা, তাফসির ও ইসলামী নৈতিকতা সম্পর্কিত জ্ঞানই মূলত দ্বীনি ইলমের অন্তর্ভুক্ত। এই জ্ঞান মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, নৈতিক চরিত্র গঠন করে এবং সঠিক-ভুলের পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করে। দ্বীনি ইলম ছাড়া একজন মুসলিমের পক্ষে সঠিকভাবে ইবাদত পালন করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়।

ইসলামে ইলম অর্জনকে অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ আমল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইলমসম্পন্ন ব্যক্তিদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার ঘোষণা দিয়েছেন।) এছাড়াও হাদিসে ইলম অর্জনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, —

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

— "প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরজ" * (২)

দ্বীনি ইলম মানুষের ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর ও পরিশুদ্ধ করে। এর মাধ্যমে মানুষ সঠিক আকিদা, বিশুদ্ধ ইবাদত ও উত্তম চরিত্র অর্জন করতে পারে। একজন দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন

ব্যক্তি হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সমাজে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। পরিবার গঠনে, সন্তানদের নৈতিক শিক্ষাদানে এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দ্বীনি ইলমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীনি জ্ঞান মানুষকে অহংকার, হিংসা, অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে এবং মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করে।

নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই দ্বীনি ইলম অর্জন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষিত ও দ্বীনদার মা একটি আদর্শ পরিবার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কারণ সন্তানদের প্রথম শিক্ষালয় হলো পরিবার। যদি পরিবারে দ্বীনি জ্ঞান ও ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা থাকে, তাহলে সন্তানরাও নৈতিক ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে উঠবে। তাই সমাজ সংস্কারের জন্য দ্বীনি শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কেরাম ও সাহাবিয়াগণ দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ও
প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজে দ্বীনি শিক্ষার অবহেলা অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে মানুষ পার্থিব জ্ঞান অর্জনের প্রতি অধিক মনোযোগী হলেও দ্বীনি জ্ঞানার্জনের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীন হয়ে পড়ছে। ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, কুসংস্কার, ভ্রান্ত আকিদা, ধর্মীয় বিভ্রান্তি ও নানা ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক মানুষ ইসলামের মৌলিক বিধান সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান রাখে না। এর ফলে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে অশান্তি, বিভ্রান্তি ও মূল্যবোধের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে।

ইসলামে আলেমদেরকে নবীদের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। কারণ তারা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং দ্বীনের জ্ঞান প্রচার করেন। একজন আলেম বা দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজে আলো ছড়িয়ে দেন এবং মানুষকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করেন। তাই দ্বীনি ইলম অর্জন ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য অপরিহার্য।

ইলম অর্জন শুধু দুনিয়া জীবনের সফলতা নয়। ইলম অর্জন পরকালীন জীবনের জন্য ও সফলতার। চিরস্থায়ী সুখের জীবন জান্নাতের যাওয়ার মাধ্যম। প্রকৃত দ্বীনি জ্ঞান মানুষের চরিত্র, আচার-আচরণ ও ইবাদতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। ফলে সে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অগ্রসর হয় এবং জান্নাত লাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠে।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,—

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।”(৩)

ইলম অর্জন শুধু দুনিয়াবি উপকার নয় বরং এটি আখিরাতের সফলতার মাধ্যম। জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা আল্লাহর কাছে এত মর্যাদাপূর্ণ যে, এর বিনিময়ে তিনি বান্দার জন্য জান্নাতে পৌঁছানোর পথ সহজ করে দেন। অর্থাৎ ইলম মানুষকে সঠিক পথ দেখায়, গুনাহ থেকে দূরে রাখে এবং জান্নাতমুখী জীবন গঠনে সাহায্য করে।

১। সূরা আলাক (আয়াত -০১)
২। সুনানে ইবনে মাজাহ (হাদিস নং -২২৪)
৩। সহিহ মুসলিম (হাদিস নং-২৬৯৯)

ইলমের পরিচয়

ইসলামে জ্ঞানার্জনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।ইলম শব্দটি আরবি "عِلْم" (ইলম) শব্দ থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো— জানা, জ্ঞান, অবগত হওয়া, উপলব্ধি করা বা কোনো বিষয়ে সঠিক ধারণা অর্জন করা। ইসলামী পরিভাষায় ইলম বলতে এমন জ্ঞানকে বোঝায়, যার মাধ্যমে মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে এবং নিজের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ ইলম মানুষকে অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে এবং আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও তাঁর বিধান সম্পর্কে অবগত করে। ইলম ছাড়া মানুষ সঠিকভাবে ইবাদত করতে পারে না এবং দ্বীনের বিধানও বুঝতে পারে না। তাই ইসলাম জ্ঞানভিত্তিক ধর্ম হিসেবে মানুষের জ্ঞানার্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

দ্বীনি ইলম মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে। একজন মানুষ যখন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে, তখন সে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। ফলে তার জীবন সুন্দর ও শৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—"مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"
"যার কল্যাণ আল্লাহ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।"(১)

ইলম সাধারণ দুই প্রকার:-

১।ইলমুদ দ্বীন (العِلْمُ الدِّينِي)

ইলমুদ দ্বীন (দ্বীনি ইলম) হলো এমন জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাকে সঠিকভাবে চিনতে পারে। এবং ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে ও কুরআন, হাদিস, ফিকাহ ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করতে পারে।

২। ইলমুদ দুনিয়া (العِلْمُ الدُّنْيَوِي)

ইলমুদ দুনিয়া (পার্থিব বা জাগতিক জ্ঞান) বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝায় যার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে এবং পার্থিব জীবনকে সুন্দর, সহজ ও উন্নতভাবে পরিচালনা করতে পারে।

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে সুন্দর ভারসাম্য রক্ষা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম কখনো শুধু আখিরাতমুখী জীবন কিংবা শুধু দুনিয়ামুখী জীবনকে সমর্থন করে না; বরং উভয় জীবনের কল্যাণ অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। তাই একজন মুসলিমের জন্য ইলমুদ দ্বীন (الْعِلْمُ الدِّيْنِي) এবংইলমুদ দুনিয়া (الْعِلْمُ الدُّنْيَوِي) উভয় জ্ঞানই গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বীনি জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথ দেখায়, আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে এবং নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। অন্যদিকে দুনিয়াবি জ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করে, সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়ন ঘটায় এবং মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই দুই জ্ঞানের সমন্বয়েই একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে সফল হতে পারে।

ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে।
একটি ভাগ হলো **ফরযে আইন** ।
ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় ভাগ হলো **ফরযে কেফায়া**।
ফরযে কেফায়া বলা হয়, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের

গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব।

এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.َ

"এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে"।

১। সহিহ বুখারী (হাদিস নং-৭১)

২। (শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪)

দ্বীনি ইলম অর্জন করা কেন ফরজ?

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَا- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়।

তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

"যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। "-তারীখে তাবারী **৬/৫৭২**

দ্বীনি ইলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য দায়িত্ব।
রাসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন — " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
("জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।")
সুনান ইবনে মাজাহ হাদিস: 224
।মানুষকে মহান আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান।
ইলম ছাড়া মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে সঠিকভাবে চিনতে পারে না, ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি জানতে পারে না এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতেও সক্ষম হয় না। তাই দ্বীনি ইলম মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের সফলতার মূলভিত্তি।

একজন মানুষ যদি নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ, হালাল-হারাম, পবিত্রতা ও দৈনন্দিন জীবনের ইসলামী বিধান সম্পর্কে জ্ঞান না রাখে, তাহলে সে অজ্ঞতার কারণে ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। এ কারণেই ইসলাম দ্বীনি জ্ঞান অর্জনকে ফরজ ঘোষণা করেছে।

দ্বীনি ইলম মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে শেখায়, ঈমানকে দৃঢ় করে এবং তাকে আল্লাহভীতিসম্পন্ন বানায়।

মানুষের মূল দায়িত্ব হলো আল্লাহর ইবাদত করা। কিন্তু ইবাদত সঠিকভাবে আদায় করার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান। একজন ব্যক্তি যদি নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ, পবিত্রতা, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কিত ইসলামী বিধান সম্পর্কে জ্ঞান না রাখে, তাহলে সে অজ্ঞতার কারণে ভুল পথে পরিচালিত হতে পার

দ্বীনি ইলম মানুষকে সঠিক আকিদা ও বিশুদ্ধ বিশ্বাস শিক্ষা দেয়। আকিদা হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। যদি কারও আকিদা শুদ্ধ না হয়, তাহলে তার ইবাদত ও আমলও গ্রহণযোগ্য হবে না। বর্তমান যুগে সমাজে নানা ভ্রান্ত মতবাদ, কুসংস্কার ও বিদআত ছড়িয়ে পড়েছে। এসব বিভ্রান্তির প্রধান কারণ হলো দ্বীনি জ্ঞানের অভাব। একজন ব্যক্তি যখন কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, তখন সে বিভ্রান্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এবং ইসলামের সরল পথে চলতে সক্ষম হয়।

দ্বীনি ইলম মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জ্ঞান মানুষকে নম্রতা, সততা, ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবতার শিক্ষা দেয়। একজন দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মিথ্যা, প্রতারণা, অহংকার, হিংসা ও অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। ফলে তার ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অর্জনকে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হলো—যে জ্ঞান ছাড়া ঈমান, নামাজ, রোজা, হালাল-হারাম ইত্যাদি সঠিকভাবে পালন করা যায় না, তা শেখা ফরজ। তাই অজ্ঞ থাকা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা

ইসলামে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব

দ্বীনি ইলম (العِلْمُ الدِّينِي) মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এটি এমন এক আলো, যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে এবং তাকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। দ্বীনি ইলম ছাড়া মানুষ তার স্রষ্টাকে সঠিকভাবে চিনতে পারে না, ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি জানতে পারে না এবং নিজের জীবনকে ইসলামের আলোকে পরিচালিত করতেও সক্ষম হয় না। তাই ইসলাম দ্বীনি জ্ঞানকে অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করেছে এবং প্রত্যেক মুসলিমকে প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে।
আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যে ওহি নাযিল করেছেন, তার প্রথম শব্দই ছিল— "اقْرَأْ" অর্থাৎ "পড়ো"। এর মাধ্যমে ইসলামে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"

অর্থঃ "পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা - আলাক:১)

ইসলামে ইলমের গুরুত্বের মূল কারণ হলো, ইলমই মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে। মানুষকে আল্লাহ তাআলা শুধু দুনিয়ার জীবন যাপনের জন্য সৃষ্টি করেননি; বরং তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কোনটি ইবাদত, কিভাবে ইবাদত করতে হবে, কোন কাজ হালাল আর কোনটি হারাম—এসব বিষয় ইলম ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তাই ইলম হলো দ্বীন পালনের ভিত্তি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রধান মাধ্যম।

ইলম হলো সকল সঠিক আমলের মূলভিত্তি ও পূর্বশর্ত। ইলম মানুষকে বিশুদ্ধ আকিদা, সঠিক ইবাদত, উত্তম চরিত্র ও আল্লাহভীতির শিক্ষা দেয়। এটি মানুষকে ভুল, বিদআত ও গুনাহ থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ দেখায়।তাছাড়া ইলম ছাড়া কোনো আমলই বিশুদ্ধ হতে পারে না। কেউ যদি নামাজ, রোজা, যাকাত বা অন্যান্য ইবাদতের বিধান না জানে, তাহলে সে সঠিকভাবে তা আদায় করতে পারবে না। তাই ইসলামে আমলের আগে ইলমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আলেমগণ বলেন, "ইলম হলো আমলের ইমাম (নেতা) এবং আমল তার অনুসারী।" অর্থাৎ ইলম পথ দেখায়, আর আমল সেই পথে চলতে সাহায্য করে।

সঠিক ইলম কারো মধ্যে থাকলে সে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। অন্যায়ের পথে চলবে না । অন্যায় কাজ করবে না। আল্লাহ তাআলার নাফরমানী তার পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে ইলম ছাড়া ব্যক্তি সাধারণত অন্যায়ের পথে চলে। অন্যায় কাজ করে এবং খুব সহজেই গুনাহে পতিত হয়।ইলম মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেয়, সঠিক আমলের পথ দেখায়, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি অর্জনে সাহায্য করে, ব্যক্তি ও সমাজকে সংশোধন করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথ উন্মুক্ত করে

দ্বীনি জ্ঞান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ যখন কোনো বান্দার ভালো চান, তখন তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। এই জ্ঞান তাকে হালাল-হারাম বুঝতে সাহায্য করে এবং সঠিক ইবাদতের পথে পরিচালিত করে। তাই ইলম অর্জন করা আল্লাহর বিশেষ রহমতের একটি নিদর্শন।

ইলম সমাজ সংস্কারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। একজন আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করেন, কুসংস্কার ও অন্যায় থেকে দূরে রাখেন এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা সমাজে প্রচার করেন। এজন্য ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে আলেমদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও দ্বীনি ইলম মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মানুষের অন্তরে তাকওয়া, ধৈর্য, সততা, বিনয় ও মানবিকতা সৃষ্টি করে। দ্বীনি জ্ঞান মানুষকে অহংকার থেকে দূরে রাখে এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তোলে।

দ্বীনি ইলম অর্জন শুধু নিজের জন্য উপকারী নয়; বরং এটি পুরো সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার পরিবার, সমাজ ও জাতিকে সঠিক পথ দেখাতে পারেন। তিনি মানুষকে ন্যায়, ইনসাফ ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেন। ফলে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বীনি ইলম মানুষের ঈমানকে দৃঢ় করে এবং তাকে আল্লাহভীতিসম্পন্ন বানায়। একজন মানুষ যখন কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করে, তখন সে আল্লাহর মহত্ব, তাঁর

নিয়ামত ও তাঁর বিধান সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে। ফলে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

“إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ”

অর্থঃ “আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে তারাই বেশি ভয় করে যারা জ্ঞানী।”

প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে নিয়ে যায় এবং তার অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করে।
দ্বীনি ইলম মানুষকে সঠিক ইবাদতের পথ শেখায়। ইলম ছাড়া ইবাদত করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ, পবিত্রতা, হালাল-হারাম ও দৈনন্দিন জীবনের ইসলামী বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন না করলে মানুষ অজ্ঞতার কারণে গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। তাই ইলম হলো সকল আমলের ভিত্তি।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ”

অর্থঃ “আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।” —(সহিহ বুখারি)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ”

অর্থঃ “আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।” —
(সহিহ বুখারি)
এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, দ্বীনি ইলম আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত এবং সৌভাগ্যের প্রতীক। যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের তাওফিক দান করেন। দ্বীনি ইলম মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জ্ঞান মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য, বিনয়, মানবতা ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেয়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি মিথ্যা, প্রতারণা, অহংকার, হিংসা ও অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। ফলে তার ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে।
রাসূল ﷺ বলেছেন—

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।” —(সহিহ বুখারি)
এই হাদিস প্রমাণ করে যে, দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ।

ইলম ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য কল্যাণকর। একজন ইলমসম্পন্ন ব্যক্তি শুধু নিজের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না; বরং পরিবার, সমাজ ও পরবর্তী প্রজন্মকেও উপকৃত করেন। সমাজে ন্যায়বিচার, সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র ও আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠার পেছনে দ্বীনি ইলমের বড় ভূমিকা রয়েছে। যখন সমাজে ইলম কমে যায়, তখন অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোমরাহি বৃদ্ধি পায়।

দ্বীনি ইলম মানুষকে গুনাহ ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে। বর্তমান যুগে সমাজে নানা ধরনের বিভ্রান্তি, কুসংস্কার, বিদআত ও নৈতিক অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়েছে। এসব থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। কারণ ইলম মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে।ইলম মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেয়, সঠিক আমলের পথ দেখায়, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি অর্জনে সাহায্য করে, ব্যক্তি ও সমাজকে সংশোধন করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথ উন্মুক্ত করে।

ইলম মানুষের হৃদয়কে জীবন্ত করে তোলে এবং তাকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়।দ্বীনি ইলম শুধু ব্যক্তিগত জীবনের জন্য নয়; বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন আলেম সমাজকে সঠিক পথ দেখান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং মানুষের মাঝে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার করেন। যখন সমাজে দ্বীনি জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পায়, তখন সমাজে শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও মুসলিম মনীষীরা দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য অসংখ্য কষ্ট সহ্য করেছেন। তারা দীর্ঘ সফর করেছেন, রাতের পর রাত জেগে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং সেই জ্ঞান মানুষের মাঝে প্রচার করেছেন। কারণ তারা জানতেন, দ্বীনি ইলম মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং এটি মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথে পরিচালিত করে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন,
“যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে না, তার জীবনে প্রকৃত মর্যাদা নেই।”

দ্বীনি ইলম অর্জনের আরেকটি বড় গুরুত্ব হলো— এটি মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ”

অর্থঃ “যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।” — (সহিহ মুসলিম)।

ইসলামে ইলম অর্জন শুধু একটি ইবাদতই নয়, বরং এটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের সফলতার চাবিকাঠি। কুরআন ও হাদিসে ইলমের এমন বহু ফযিলত বর্ণিত হয়েছে, যা অন্য অনেক নফল ইবাদতের ক্ষেত্রেও এভাবে উল্লেখ করা হয়নি। একজন ইলম অর্জনকারী ব্যক্তি দুনিয়াতে সম্মান, প্রজ্ঞা ও সঠিক পথ লাভ করেন, আর আখিরাতে আল্লাহর বিশেষ মর্যাদা ও পুরস্কারের অধিকারী হন।

আল্লাহ তাআলা ইলম ও ঈমানের অধিকারীদের জন্য উচ্চ মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন আলেম ও ইলম অনুযায়ী আমলকারীদের মর্যাদা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক উঁচু হবে। কারণ তারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত করেছেন এবং অন্যদেরও সেই পথ দেখিয়েছেন।

ইলম এমন এক নূর, যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনকে আলোকিত করে। দুনিয়াতে এটি মানুষকে সম্মান, সঠিক পথ, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি দান করে। আর আখিরাতে জান্নাতের পথ সহজ করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হয়, নবীদের উত্তরাধিকারী বানায় এবং মৃত্যুর পরও অবিরাম সওয়াবের ব্যবস্থা করে। এজন্যই ইসলামে ইলম অর্জনকে সর্বোত্তম ইবাদতগুলোর একটি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং প্রত্যেক মুসলিমকে তার প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কুরআনের আলোকে ইলমের মর্যাদা

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই হলো ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি।

কুরআন মাজিদে ইলমকে মানুষের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ ইলমই মানুষকে তার রবের পরিচয় দেয়, জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইলমের মর্যাদা, জ্ঞানীদের সম্মান এবং ইলম অর্জনের গুরুত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

কুরআনের দৃষ্টিতে ইলম শুধু তথ্য বা জ্ঞান অর্জনের নাম নয়; বরং এমন জ্ঞান, যা মানুষকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে এবং তার আমল ও চরিত্রকে সুন্দর করে।ইসলামে ইলম বা জ্ঞানের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব, জ্ঞানীদের সম্মান এবং অজ্ঞতার ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেছেন। ইলম মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য শেখায় এবং আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভে সাহায্য করে। এজন্য ইসলাম জ্ঞানকে মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।

(সূরা নাহল :আয়াত ৪৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করবে এবং শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।

(সূরা জুমুআহ :আয়াত ২)

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহর ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী সাঃ আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেনঃ

يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। (সূরা ফুরকান : আয়াত ৩০)

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি আপনার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, আপনি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবেন, যা আপনাকে শেখানো হয়েছে।

(সূরা কাহাফ : আয়াত৬৬)

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন
رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দেন।
(সূরা ত্ব-হা:আয়াত ১১৪)

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন,
ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ
وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْن.

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়।
(সূরা তাওবা : আয়াত ১২২)

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেনঃ

কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না।

(তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮)

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন—

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"আর বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।"

— (সূরা ত্ব-হা, ২০:১১৪)

এই আয়াতটি কুরআনে ইলমের মর্যাদা ও গুরুত্বের এক অনন্য প্রমাণ। চিন্তা করলে দেখা যায়, কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনেক বিষয়ের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এভাবে সরাসরি দোয়া করার নির্দেশ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সম্পদ বৃদ্ধি, ক্ষমতা বৃদ্ধি বা পার্থিব কোনো বিষয় বৃদ্ধি করার জন্য দোয়া করতে বলেননি; বরং বলেছেন ইলম বৃদ্ধি করার জন্য দোয়া করতে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো উপকারী ইলম।

কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনেক বিষয়ের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এভাবে সরাসরি দোয়া করার নির্দেশ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সম্পদ বৃদ্ধি, ক্ষমতা বৃদ্ধি বা পার্থিব কোনো বিষয় বৃদ্ধি করার জন্য দোয়া করতে বলেননি; বরং বলেছেন ইলম বৃদ্ধি করার জন্য দোয়া করতে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো উপকারী ইলম।

—ইলম অর্জনের কোনো শেষ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তারপরও তাঁকে ইলম বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে বলা হয়েছে। তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য সারাজীবন ইলম অন্বেষণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা সহজেই অনুমান করা যায়। একজন মুমিন কখনো নিজেকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মনে করবেন না; বরং যত ইলম অর্জন করবেন, ততই নিজের অজ্ঞতা উপলব্ধি করবেন এবং আরও জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

কুরআন অধ্যয়ন ইলমে দ্বীন অর্জনের মূল ভিত্তি, দুনিয়ার কল্যাণের পথপ্রদর্শক এবং আখিরাতের মুক্তির মাধ্যম। কুরআনের জ্ঞান মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে, চিন্তাকে শুদ্ধ করে এবং জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, অর্থ অনুধাবন ও গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে এর শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। কেননা কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক যত গভীর হবে, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার সম্ভাবনাও তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

হাদিসের আলোকে ইলমের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসসমূহে ইলমের গুরুত্ব, ফযিলত এবং প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। হাদিস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, ইলমকে ইসলামের ভিত্তি, আমলের পথপ্রদর্শক এবং জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একজন মুসলিমের ঈমান, ইবাদত, আখলাক ও জীবনযাত্রা সঠিক হওয়ার জন্য ইলম অপরিহার্য। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে ইলম অর্জনের প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন, এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-
مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ .

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ

করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। -
আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪
উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'ওই ব্যক্তি আমার আদর্শের ওপর নাই, যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করে না।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২২১৪৩, মুস্তাদরাকে হাকেম : ৩৮৪)

আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ
"একজন আলেমের মর্যাদা একজন ইবাদতকারীর উপর এমন, যেমন পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য নক্ষত্রের উপর।"
— সুনানে তিরমিযি, হাদিস: ২৬৮২; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৩৬৪১

কারণ একজন ইবাদতকারী সাধারণত নিজের উপকার করেন, কিন্তু একজন আলেম নিজের পাশাপাশি অসংখ্য মানুষের উপকার করেন। তাঁর জ্ঞান মানুষের জীবন পরিবর্তন করে, তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং সমাজে হেদায়েতের আলো ছড়িয়ে দেয়। তাই আলেমের প্রভাব ও উপকারিতা অনেক ব্যাপক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
"অথবা এমন উপকারী জ্ঞান, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।"
— সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৩১
এই হাদিসে উপকারী ইলমকে সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি যদি মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেন, দ্বীনি বই লিখেন, উপকারী জ্ঞান প্রচার করেন বা এমন কিছু শিক্ষা দিয়ে যান যা মানুষকে উপকৃত করে, তাহলে তার মৃত্যুর পরও সেই কাজের সওয়াব তার আমলনামায় পৌঁছাতে থাকে। এ কারণে ইলমকে এমন একটি সম্পদ বলা হয়, যার উপকারিতা কখনো শেষ হয় না।

হাদিসের আলোকে ইলম এমন এক নেয়ামত, যা মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে, ফেরেশতাদের সম্মানের পাত্র বানায় এবং নবীদের উত্তরাধিকার লাভের সুযোগ দেয়। ইলম মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, আমলকে বিশুদ্ধ করে এবং মৃত্যুর পরও অবিরাম সওয়াবের ব্যবস্থা করে। তাই একজন মুসলিমের জীবনে দ্বীনি ইলম অর্জন কোনো অতিরিক্ত বিষয় নয়; বরং এটি দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য অপরিহার্য একটি দায়িত্ব।

নবী রাসূলগনের জীবনে ইলমের গুরুত্ব

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নবী রাসূলগনকে মানবজাতির পথপদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেওয়া, এক আল্লাহ ইবাদত করা এবং সঠিক শিক্ষা দেওয়া ও পথ দেখানো। অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করা।আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবী-রাসূলকে ওহির মাধ্যমে যে জ্ঞান দান করেছেন, সেটিই ছিল মানবজাতির জন্য হেদায়েতের মূল উৎস। তাই তাঁদের পুরো জীবনই ছিল ইলমের চর্চা, প্রচার এবং বাস্তব প্রয়োগের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

নবী-রাসূলগণ শুধু ইলম গ্রহণই করেননি, বরং তাঁরা সেই ইলম মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন অত্যন্ত ধৈর্য, প্রজ্ঞা এবং সুন্দর আচরণের মাধ্যমে। তাঁরা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, কীভাবে ন্যায় ও ইনসাফের পথে চলতে হবে এবং কীভাবে জীবনকে পাপ ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। তাঁদের দাওয়াতি জীবনের প্রতিটি ধাপই ছিল ইলমের ভিত্তিতে পরিচালিত। বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবন ছিল ইলমের সর্বোচ্চ উদাহরণ, যেখানে তিনি সাহাবাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দিতেন, তাদের চরিত্র সংশোধন করতেন এবং বাস্তব জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতেন।

এজন্য নবী–রাসূলগণের জীবনে ইলম বা জ্ঞানের গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশি।উনারা নিজের ইলম অর্জন করতেন এবং অন্যদের শিক্ষা দিতেন।আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে ও গায়েবী ভাবে উনাদের ইলম শিক্ষা দিতেন।যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূলগনের আগমন ঘটেছে পৃথিবীতে। নবী রাসূলগনের প্রধান দায়িত্ব ছিল মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সম্পর্কে জানা এক স্রষ্টা হিসেবে মানা ও আল্লাহর দেওয়া সঠিক জীবন পরিচালনা করার পথ দেখানো। এরজন্য প্রয়োজন ইলম অর্জন করা ও তা নিজে প্রযোগ করা এবং অন্যদের শিক্ষা দেওয়া।তারা নিজেরা জ্ঞানের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মানুষকেও ইলম অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করতেন।

মানবজাতির প্রথম নবী আদম (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
("আর তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও।')
(সূরা বাক্বারা :৩১)

মানবজাতির প্রথম নবী আদম (আ.)-কে জ্ঞান দানের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ আদম (আ.)-কে বিভিন্ন বস্তুর নাম ও পরিচয় শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা ফেরেশতাদের জানা ছিল না। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইলমের মর্যাদা ও মানুষের উপর জ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানের কারণেই আদম (আ.) সম্মানিত মর্যাদা লাভ করেন।

নবী-রাসূলগণ তাঁদের জীবনে ইলমকে শুধু ব্যক্তিগত জ্ঞান হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তা বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা পরিবার, সমাজ, বিচারব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব—সবকিছুই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে পরিচালনা করেছেন। ফলে তাঁদের জীবন ছিল জ্ঞান ও আমলের এক জীবন্ত উদাহরণ। তাঁদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি শিক্ষা এবং প্রতিটি দিকনির্দেশনা ছিল ইলমের ভিত্তিতে, যা মানুষকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করেছে।

ইসলামের সূচনাই হয়েছে জ্ঞান ও শিক্ষার আহ্বানের মাধ্যমে। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের শিক্ষা দিতেন, কুরআন ব্যাখ্যা করতেন এবং মানুষের মাঝে দ্বীনি জ্ঞান প্রচার করতেন। তিনি মসজিদে শিক্ষার আসর বসাতেন এবং জ্ঞানীদের বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

নবী–রাসূলগণের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল—তারা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতেন এবং মানুষকে সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনার শিক্ষা দিতেন। তাদের জীবন ছিল ইলম ও আমলের সমন্বিত বাস্তব উদাহরণ। তারা শুধু তত্ত্বগত জ্ঞান দেননি; বরং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন।

এছাড়াও নবীগণ মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তারা মানুষকে সত্য জ্ঞান দান করে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। ফলে সমাজে ন্যায়, শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নবী-রাসূলগণের জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ইলম হলো হিদায়াতের মূল চাবিকাঠি এবং সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। তাঁদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ইলমের গুরুত্বকে বাস্তবভাবে তুলে ধরে, যা আমাদের শেখায়—ইলম অর্জন করা, তা বোঝা এবং তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া একজন মুমিনের অন্যতম বড় দায়িত্ব।

সাহাবায়ে কেরামে ইলম চর্চা

সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন ইসলামের প্রথম প্রজন্ম এবং মানবজাতির মধ্যে নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে সরাসরি দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাদের ইলমচর্চা শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্য ছিল না; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, দ্বীনকে জানা, আমল করা এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছিল। এ কারণেই তারা অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ও আদর্শ জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবন ছিল ইলম, আমল ও তাকওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং সেই জ্ঞান মানুষের মাঝে প্রচার করতেন। ইসলামের প্রসার ও সংরক্ষণে সাহাবায়ে কেরামের ইলম চর্চার অবদান অপরিসীম।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, মুখস্থ করতেন এবং তা জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেন। তারা জানতেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা ও কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ। তাই তারা ইলম অর্জনের জন্য সময়, শ্রম এবং আরাম-আয়েশ সবকিছু ত্যাগ করতেন।সাহাবায়ে কেরাম কুরআন ও হাদিস শেখার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি কথা ও কাজ মনোযোগের সাথে শিখতেন এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতেন। অনেক সাহাবি দিনের অধিকাংশ সময় ইলম অর্জনের জন্য ব্যয় করতেন। তারা বুঝতেন যে, ইলম ছাড়া সঠিকভাবে ইসলাম পালন করা সম্ভব নয়।

আবু হুরাইরা (রা.) ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদিস বর্ণনাকারী। তিনি সর্বদা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্যে থাকতেন এবং তাঁর কথা মুখস্থ করতেন। তিনি বলেছেন যে, অন্য সাহাবিরা ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকলেও তিনি ইলম অর্জনের জন্য অধিক সময় ব্যয় করতেন। ফলে তিনি বিপুল সংখ্যক হাদিস সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন।

সাহাবিদের ইলম চর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল—তারা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতেন। তারা শুধু মুখস্থ বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়ন করতেন। এজন্য তাদের জীবন ছিল কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন তাফসির ও কুরআনি জ্ঞানের অন্যতম বড় আলেম। অল্প বয়স থেকেই তিনি ইলম অর্জনের জন্য গভীর আগ্রহ দেখান। তিনি বিভিন্ন সাহাবির দরজায় গিয়ে হাদিস ও জ্ঞান শিক্ষা করতেন। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে তাঁকে "তরজুমানুল কুরআন" বলা হতো।ইসলামের ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন সেই সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব, যারা সরাসরি নবী করিম (সা.)-এর সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন করেছেন এবং তা নিজেদের জীবন দিয়ে বাস্তবায়ন করেছেন। তাদের কাছে ইলম শুধু তথ্যের সংগ্রহ নয়, বরং তা ছিল আমল, চরিত্র গঠন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনন্য মাধ্যম।

আজ যখন ইলম অর্জন করা অনেক সহজ। হাতের কাছেই কোরআন-হাদিসের নির্ভরযোগ্য সংকলন। সেখানে সাহাবায়ে কেরাম একটি হাদিসের সন্ধানে মাসের পর মাস সফর করতে থাকতেন।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, এক ব্যক্তির ব্যাপারে আমি জানতে পারলাম যে, তিনি রাসুল (সা.) থেকে কিসাস সম্পর্কিত একটি হাদিস শুনেছেন।হাদিসটি জানার জন্য একটি উট ক্রয় করে বের হয়ে পড়লাম। এক মাসের দীর্ঘ সফর শেষে আমি সিরিয়ায় এসে পৌঁছাই। খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রা.। তার বাড়ির দরজায় গিয়ে দারোয়ানকে বললাম, তাঁকে গিয়ে বল জাবের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।শুনে ভেতর থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইবনে আবদুল্লাহ? আমি বললাম, হ্যাঁ। এ কথা শুনেই তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। একে অপরের হালপুরসি ও সৌজন্য বিনিময় শেষে আমি বললাম, কিসাস সম্পর্কিত একটি হাদিস নাকি আপনি নবীজি (সা.) থেকে সরাসরি শুনেছিলেন। হাদিসটি শোনার আগেই আমি বা আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেই কি না-এ কথা ভেবে আমি দ্রুত আপনার কাছে এসেছি। তিনি তখন আমাকে হাদিসটি শুনিয়ে দিলেন।(মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস: ৮৭৫৪)

একবার আইউব আনসারি রা. দীর্ঘ সফর করে মিসরে উক্বা ইবনে আমের রা.-এর কাছে এলেন। এসেই বললেন, আমি ও আপনি বাদে ওই সময় নবীজীর দরবারে উপস্থিত ছিলেন এমন কেউই আজ জীবিত নেই। অতএব বলুন তো মুসলমান ভাইয়ের দোষত্রুটি অপরের কাছে প্রচার না করার ব্যাপারে আপনি কী শুনেছিলেন? তিনি বললেন, আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারও ভুল—ত্রুটি ঢেকে রাখল, কিয়ামতের দিন আল্লাহও তার দোষ—ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন।' হাদিসটি শোনার পর আবু আইউব রা. আর এক মুহূর্তও দাঁড়াননি। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফের রওনা হলেন মদিনার পথে। (মুসনাদে আহমাদ ৪/১৫)
এমনকি খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর রা. কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে কোন দ্বিধা না করে জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিতেন, এ ব্যাপারে নবীজির কোনো নির্দেশনা কারও জানা আছে কি না? (আর-রিসালাহ, ইমাম শাফেয়ি: ৪২৭)

এভাবেই সাহাবায়ে কেরাম রাতের নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে, দিনের পরিশ্রম উপেক্ষা করে, দূর-দূরান্তে সফর করে এবং প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে জ্ঞান অর্জন করতেন। তাইতো তাদের ইলম-চর্চার কথা আজও মুসলিম উম্মাহর জন্য এক স্বরণীয় অধ্যায়।কঠোর ত্যাগ ও সফর: একটি হাদিসের সন্ধানে সাহাবি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এক মাসের পথ পাড়ি দিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন।তাঁদের কাছে ইলম মানে কেবল তথ্যের সংগ্রহ ছিল না; বরং প্রতিটি শিক্ষার বাস্তবায়ন ও চরিত্র গঠনই ছিল মূল উদ্দেশ্য।তাঁরা শুনে, মুখস্থ করে এবং পরবর্তীতে লিখিত রূপ দিয়ে দ্বীন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম শুধু জ্ঞান অর্জনেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং তারা সেই জ্ঞান অন্যদের ন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে যায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের ইলম অর্জনে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলেছেন—

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً”

“আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।”
(সহিহ বুখারি — হাদিস: 3461)

সাহাবায়ে কেরামের ইলম চর্চা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, ইলম অর্জনের জন্য ধৈর্য, ত্যাগ ও আন্তরিকতা প্রয়োজন। তারা দুনিয়ার কষ্ট সহ্য করে হলেও জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং উম্মতের জন্য সেই জ্ঞান সংরক্ষণ করেছেন। তাই বর্তমান মুসলিম সমাজের উচিত তাদের আদর্শ অনুসরণ করে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান অর্জনে মনোযোগী হওয়া।রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস সংরক্ষণ ও প্রচারে সাহাবায়ে কেরামের অবদান অপরিসীম। তারা নবী ﷺ-এর কথা ও কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মুখস্থ রাখতেন এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতেন।আবু হুরায়রা (রা.) সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি হিসেবে পরিচিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে থেকে হাজার হাজার হাদিস মুখস্থ করেছিলেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন এবং ইসলামের শিক্ষা প্রচার করেন। তাদের মাধ্যমেই কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে। তারা ছিলেন ইসলামের প্রথম শিক্ষক ও দাঈ।

আলেমদের সম্মান ও মর্যাদা

ইসলামে আলেমদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। কারণ তারা মানুষকে আল্লাহর পথ দেখান, কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান শিক্ষা দেন এবং সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আলেমগণ নবীদের উত্তরসূরি হিসেবে পরিচিত। তারা দ্বীনের জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। এজন্য ইসলাম আলেমদের সম্মান করতে এবং তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে উৎসাহ দিয়েছে।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ

“নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরসূরি।”(১)

আলেমদের সম্মান করা মূলত দ্বীনের সম্মান করারই অংশ। কারণ তারা মানুষের ঈমান ও আমল সংশোধনের কাজ করেন।দ্বীন সম্পর্কে বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হ’লেন আলেম।যারা দ্বীনের সংরক্ষণ, দ্বীনী ইলম বিতরণ ও প্রচার-প্রসারের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। ফলে ইহকালে যেমন তারা নন্দিত ও বরিত হন, তেমনি পরকালে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে সম্মানিত ও সফলতা লাভে ধন্য হবেন।

পৃথিবীর সকল মানুষকে কখনও না কখনও আলেমের মুখাপেক্ষী হ’তে হয়। আমল বাস্তবায়নের জন্য আলেমদের থেকে জ্ঞান লাভ করা যরূরী। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ،

“যদি তোমরা না জানো, তাহ’লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর”।(২)

উপরোক্ত আয়াতে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ এসেছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন,
“আহলুয যিকর’ হ’ল ‘আহলুল কুরআন’। কেউ কেউ বলেন, আহলু যিকর হ’ল জ্ঞানীগণ।
আব্দুর রহমান আস-সা‘দী (রহঃ) বলেন,-

“এই আয়াতে জ্ঞানীদের প্রশংসা করা হয়েছে। কেননা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করার আদেশ দেওয়া হয়েছে”।(৩)

আলেমদেরকে জিজ্ঞেস না করে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করলে দুনিয়া ও আখেরাতে বিপদ হ’তে পারে। যেমন পূর্বযুগে ৯৯ জনকে হত্যাকারী ব্যক্তির ঘটনা। এজন্য আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন

,مثل العلماء فى الناس كمثل النجوم فى السماء يهدى بها ،

“মানুষের মধ্যে আলেমদের উদাহরণ আকাশের নক্ষত্রের মত। যার দ্বারা পথের দিশা লাভ করা যায়”।(৪)

আল্লাহ দ্বীনী ইলমের অধিকারীকে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদাবান করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ،

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন”।(৫)

প্রকৃত আলেম তারা যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞানে বিজ্ঞ। আর এই জ্ঞান তাদেরকে সম্মানিত করে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِن الله يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

“আল্লাহ তা‘আলা এ কিতাব কুরআনের মাধ্যমে কোন কোন জাতিকে উন্নতি দান করেন। আবার অন্যদেরকে করেন অবনত”(৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন

,مَدَحَ اللهُ الْعُلَمَاءَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ‘ ،

“আল্লাহ এই আয়াতে আলেমদের প্রশংসা করেছেন’।(৭)

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما، فالعلم يزيد الشريف شرفاً ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك ،

‘নিশ্চয়ই ইলম তার অধিকারীকে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদাবান করে, যা রাজত্ব, সম্পদ বা অন্য কিছু করতে পারে না। আর ইলম মর্যাদাবানের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়

এবং মালিকানাধীন দাসকে উঁচু করে তোলে যতক্ষণ না সে রাজাদের পরিষদে বসে'।(৮)

দুনিয়া ও আখেরাতে দ্বীনী জ্ঞানে পারদর্শিরাই সম্মানিত হবেন। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক মুত্ত্বাকী। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহ'লে আল্লাহর নবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহ'লে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ?

'خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْا' ،

জাহেলী যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করেন'।(৯)

ইসলামে আবেদ অপেক্ষা আলেমের মর্যাদা অধিক। আবূ উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

,فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرِ،َ

'আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঠিক তদ্রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমান-যমীনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের পিপড়া এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য কল্যাণ কামনা ও নেক দো'আ করে থাকে'।(১০)

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আবেদ বা ইবাদতকারী ব্যক্তির উপর আলেমের মর্যাদা হ'ল যেমন সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা'।(১১)

হাসান বছরী (রহঃ) হ'তে মুরসালরূপে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বনী ইসরাঈলের দু'জন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তাদের একজন ছিলেন আলেম, যিনি ওয়াক্তিয়া ফরয ছালাত আদায় করার পর বসে বসে মানুষকে তা'লীম দিতেন। আর দ্বিতীয়জন দিনে ছিয়াম পালন করতেন এবং রাত জেগে ইবাদত করতেন। রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, এ দু'ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে

উত্তম কে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ফরয ছালাত আদায় করার পর যে ব্যক্তি মানুষকে তা‘লীম দেয়, সে দিনে ছিয়াম পালনকারী ও রাতে ইবাদাতকারী অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপরে আমার মর্যাদা।(১২)

আলী (রাঃ) বলেন,

العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد ،

‘একজন আলেম ছিয়াম পালনকারী, তাহাজ্জুদ আদায়কারী ও মুজাহিদের চেয়েও উত্তম’।(১৩)

উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ
كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّه ،

‘সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না’।(১৪)

আলেমদের সম্মান করা ইসলামী আদবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ তাদের মাধ্যমে মানুষ দ্বীনের সঠিক শিক্ষা লাভ করে। সমাজে যখন আলেমদের মর্যাদা রক্ষা করা হয়, তখন দ্বীনের শিক্ষা ও মূল্যবোধও সংরক্ষিত থাকে। পক্ষান্তরে আলেমদের অবমূল্যায়ন করলে দ্বীনি জ্ঞানের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয় এবং সমাজে বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পায়।আলেমগণ কেবল জ্ঞানদাতা নন; তাঁরা সমাজের সংস্কারক, পথপ্রদর্শক এবং নৈতিকতার শিক্ষক। তাঁরা মানুষের মধ্যে তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও উত্তম চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই তাদের যথাযথ সম্মান করা, তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।আলেমদের সম্মান ও মর্যাদা ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা।

কুরআন ও হাদিসে তাদের যে উচ্চ স্থান বর্ণিত হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে আলেমদের সম্মান করা মূলত দ্বীনকে সম্মান করারই অংশ। যে সমাজ আলেমদের যথাযথ মর্যাদা দেয়, সে সমাজ জ্ঞান, নৈতিকতা ও তাকওয়ার আলোয় আলোকিত হয়।

১।(সুনান আবু দাউদ — হাদিস: 3641)

২।(নাহল ১৬/৪৩; আম্বিয়া ২১/৭)

৩।(তাফসীরে সা‘দী, সূরা নাহল ৪৩নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

৪।(আখলাকুল ওলামা, পৃ. ৪২; নাযরাতুন নাঈম ৭/২৯৭৮।)

৫।(মুজাদালা ৫৮/১১)

৬।(মুসলিম হা/৮১৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৮; ছহীহাহ হা/২২৩৯।)

৭। বুখারী হা/৩৩৫৩; মুসলিম হা/২৩৭৮।

৮।ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃ: ৮৬।

৯।বুখারী হা/৩৩৫৩; মুসলিম হা/২৩৭৮।

১০।তিরমিযী হা/২৬৮৫; ছহীহুত তারগীব হা/৭৭।

১১।আবূদাউদ হা/৩৬৪১; ছহীহুল জামে‘ হা/৪২১২।

১২।দারেমী হা/৩৪০, মিশকাত হা/২৫০। আলবানী, সনদ হাসান।

১৩।ফাহারিস লিসানুল আরব ১/৩২০; নাজরাতুন নাঈম ৭/২৯৭৬।

১৪।আহমাদ হা/২২৭৫৫; ছহীহুত তারগীব হা/৯৫।

ইলম অর্জনে নিয়তের গুরুত্ব

ইসলামে প্রতিটি কাজের মূল ভিত্তি হলো নিয়ত। ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি, দ্বীন জানা ও মানুষের উপকার করা হয়, তাহলে সেই ইলম বরকতময় হয়। কিন্তু যদি কেউ অহংকার, খ্যাতি বা দুনিয়াবি লাভের জন্য ইলম অর্জন করে, তবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

ইসলামে ইলম অর্জনকে শুধু পড়াশোনা বা তথ্য সংগ্রহ হিসেবে দেখা হয়নি; বরং এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এই ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে নিয়ত (উদ্দেশ্য) এর ওপর। নিয়ত যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে ইলম হয় নূর, হেদায়েত ও জান্নাতের পথ; আর নিয়ত যদি দুনিয়ামুখী হয়, তাহলে সেই ইলম গুনাহ ও ধ্বংসের কারণও হতে পারে

ইসলামে প্রতিটি আমলের গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্য নির্ভর করে নিয়তের উপর। ইলম অর্জনও এর ব্যতিক্রম নয়। একজন মানুষ কেন ইলম অর্জন করছে—আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, দ্বীনের সেবা এবং নিজের আমল সংশোধনের জন্য, নাকি মানুষের প্রশংসা, খ্যাতি ও পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য—এটাই তার ইলমের বরকত ও প্রতিদানের ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। তাই ইলম অর্জনের শুরুতেই নিয়ত শুদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি।
রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।”
— (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭)

এই হাদীস প্রমাণ করে যে ইলম অর্জনের মতো মহান আমলও বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। কেউ যদি মানুষের মাঝে মর্যাদা লাভ, বিতর্কে জয়লাভ বা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে, তবে সে ইলম তার জন্য কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হতে পারে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি এমন ইলম অর্জন করে, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কিন্তু সে তা কেবল দুনিয়াবি স্বার্থ লাভের জন্য অর্জন করে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"

(— সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৩৬৬৪)

এই হাদীস ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়তের গুরুত্বকে অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরে। কারণ একই ইলম একজনকে জান্নাতের পথে নিয়ে যেতে পারে, আবার ভুল নিয়তের কারণে তাকে শাস্তির মুখোমুখিও করতে পারে।

সালাফে সালেহীন নিয়ত শুদ্ধ করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। অনেক আলেম বলেছেন,

"আমরা ইলমের চেয়ে নিয়ত সংশোধনের জন্য বেশি সংগ্রাম করেছি।"

কারণ মানুষের অন্তরে কখনো কখনো অহংকার, আত্মপ্রশংসা বা খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা প্রবেশ করতে পারে। তাই একজন তালিবুল ইলমের উচিত নিয়মিত নিজের নিয়ত পর্যালোচনা করা এবং আল্লাহর কাছে ইখলাসের জন্য দোয়া করা।

ইলম অর্জনের সঠিক নিয়ত হতে পারে—আল্লাহকে জানা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা, নিজের আমল সংশোধন করা, দ্বীনের সঠিক জ্ঞান প্রচার করা, অজ্ঞতা দূর করা এবং উম্মাহর কল্যাণ সাধন করা। যখন এসব মহৎ উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা হয়, তখন সেই ইলম ইবাদতে পরিণত হয় এবং আল্লাহ তাআলা তাতে বরকত দান করেন।

তাই ইলম অর্জনের সময় অন্তরকে বিশুদ্ধ রাখা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রধান লক্ষ্য বানানো অত্যন্ত জরুরি।

ইলম অর্জনের মূল ভিত্তি হলো নিয়ত। নিয়ত ছাড়া ইলম শুধু তথ্য হয়, কিন্তু সঠিক নিয়ত থাকলে সেই ইলম হয় নূর, হেদায়েত এবং জান্নাতের পথ। একজন মানুষের মর্যাদা তার জ্ঞানের পরিমাণে নয়; বরং তার নিয়তের বিশুদ্ধতায়। তাই প্রত্যেক তালিবুল ইলমের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো নিজের নিয়তকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি রাখা এবং সেই ইলমকে নিজের জীবন ও সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করা।

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ تَعَلّمَ عِلْمًا مِمّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزّ وَجَلّ لَا يَتَعَلّمُهُ إِلّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪)

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا تَعَلّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنّارَ النّارَ.

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। (-সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭)

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيّتُه.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে। (-আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭)

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়।

ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভ,ত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব

ইলম অর্জনের আদব ও পদ্ধতি

ইলম অর্জনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব রয়েছে। যেমন—শিক্ষকের প্রতি সম্মান দেখানো, মনোযোগ দিয়ে পাঠ শোনা, ধৈর্য ধারণ করা এবং বিনয়ের সাথে জ্ঞান অর্জন করা। সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত আদবের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি হলো ধাপে ধাপে শিক্ষা গ্রহণ করা, কুরআন ও হাদিসকে ভিত্তি বানানো এবং নিয়মিত অধ্যয়ন করা। আদব ছাড়া ইলম পূর্ণতা লাভ করে না।)

ইলম অর্জনের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো নিয়তকে বিশুদ্ধ করা। একজন শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন, দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। দুনিয়াবী সম্মান, মানুষের প্রশংসা, বিতর্কে জয়লাভ বা পদমর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। বিশুদ্ধ নিয়ত ইলমে বরকত আনে, জ্ঞানকে উপকারী করে এবং শিক্ষার্থীর হৃদয়ে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে। তাই ইলম অর্জনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের নিয়তকে পরিশুদ্ধ রাখা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য। মহানবী (সাঃ) বলেছেন—

“নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১)। সুতরাং ইলম অর্জনের প্রকৃত সফলতা নির্ভর করে নিয়তের বিশুদ্ধতার।

ইলম অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো উস্তাযের প্রতি যথাযথ সম্মান, বিনয় ও শিষ্টাচার বজায় রাখা। ইসলামী ঐতিহ্যে উস্তায কেবল জ্ঞানের বাহক নন; বরং তিনি শিক্ষার্থীর আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নেরও পথপ্রদর্শক। তাই একজন তালিবে ইলমের জন্য আবশ্যক হলো উস্তাযের সামনে নম্রতা অবলম্বন করা, তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং প্রয়োজন ছাড়া তাঁর বক্তব্যে বাধা সৃষ্টি না করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান সময়ে অনেক শিক্ষার্থী ইলম অর্জনের চেষ্টা করলেও ইলমের আদব শেখার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না। ফলে অনেক সময় উস্তাযের সঙ্গে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে আদবের সীমারেখা অতিক্রম হয়ে যায়।

ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং দ্বীনের সঠিক জ্ঞান লাভ করা। কখনোই আলেমদের সঙ্গে গর্ব করা, মূর্খদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া বা মানুষের মাঝে মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা এজন্য ইলম অর্জন করো না যে, তা দ্বারা আলেমদের সঙ্গে গর্ব করবে, মূর্খদের সঙ্গে বিতর্ক করবে কিংবা মজলিসে নেতৃত্ব লাভ করবে। যে এমন করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।"
(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ৭৭)।
এই হাদিস ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়তের বিশুদ্ধতার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

ইলম শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো 'ইশকাল' বা জটিল বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা। তবে ইশকাল এবং ইতিরায (আপত্তি) এক বিষয় নয়। ইশকাল হলো কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে বিনয়ের সঙ্গে তার ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া, আর ইতিরায হলো আপত্তি ও বিরোধিতার মনোভাব প্রকাশ করা। একজন তালিবে ইলমের উচিত উস্তাযের নিকট নিজের সংশয় বা জটিলতা অত্যন্ত নম্রতা ও ভদ্রতার সঙ্গে উপস্থাপন করা। প্রশ্নের ভঙ্গিতে যেন কখনো তর্ক, অহংকার বা নিজেকে জাহির করার প্রবণতা প্রকাশ না পায়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো আলোচনার মাঝখানে উস্তাযকে থামিয়ে প্রশ্ন না করা। বরং সম্পূর্ণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর সুযোগ বুঝে প্রশ্ন করা উত্তম। অনেক সময় এমন হয় যে, আলোচনার পরবর্তী অংশেই সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর চলে আসে। তাই ধৈর্যসহকারে পুরো আলোচনা শোনা একজন শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি শুধু আদবেরই অংশ নয়, বরং জ্ঞানার্জনের একটি কার্যকর পদ্ধতিও বটে।

তাছাড়া প্রশ্ন করার পূর্বে উস্তাযের অনুমতি গ্রহণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার। এতে শিক্ষার্থীর বিনয় ও ভদ্রতা প্রকাশ পায়। উস্তাযের কাছে এমন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত, যা বাস্তবেই তার কাছে অস্পষ্ট বা সন্দেহজনক মনে হয়েছে। যে বিষয় পূর্ব থেকেই জানা আছে বা অন্য কোনো কিতাব, শরহ কিংবা আলেমের কাছ থেকে জানা হয়েছে, তা শুধু নিজের জ্ঞান প্রকাশের উদ্দেশ্যে উত্থাপন করা ইলমের আদবের

পরিপন্থী। প্রকৃত তালিবে ইলম নিজের জ্ঞান প্রদর্শনের জন্য নয়; বরং অজানা বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করে।

ইলম অর্জনের অন্যতম মৌলিক আদব হলো এর সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় কেবল জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়; বরং সেই জ্ঞান অর্জনের পেছনে নিয়ত ও উদ্দেশ্য কী, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সালাফে সালেহীন ইলম শিক্ষার পাশাপাশি আদব ও আচার-আচরণ শিক্ষার প্রতিও সমান গুরুত্ব দিতেন। প্রসিদ্ধ তাবিঈ ইমাম ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, –
"তাঁরা যেভাবে ইলম শিক্ষা করতেন, সেভাবেই আদব ও উত্তম আচরণও শিক্ষা করতেন।"
(আল-জামি লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি', ১/৭৯)।
এ বাণী থেকে স্পষ্ট হয় যে, আদব ইলমের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং প্রকৃত ইলম তখনই উপকারী হয়, যখন তা উত্তম চরিত্র ও বিশুদ্ধ নিয়তের সঙ্গে অর্জিত হয়।

একজন মুসলিমের ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ, দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন, নিজের আমল সংশোধন এবং সমাজে কল্যাণ ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু যদি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হয় খ্যাতি অর্জন, মানুষের প্রশংসা লাভ, আলেমদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা বা অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা, তবে সেই ইলম বরকতহীন হয়ে যায়।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন,-
"তোমরা এজন্য ইলম অর্জন করো না যে, তা দ্বারা আলেমদের সঙ্গে গর্ব করবে, মূর্খদের সঙ্গে বিতর্ক করবে কিংবা মজলিসে নেতৃত্ব লাভ করবে। যে এমন করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।"
(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ৭৭)।
এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, ইলমের মর্যাদা যত মহান, এর অপব্যবহারের শাস্তিও তত ভয়াবহ।

বর্তমান যুগে অনেক সময় ইলমকে আত্মপ্রদর্শন, বিতর্কে জয়লাভ বা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অথচ প্রকৃত তালিবে ইলম নিজের অজ্ঞতা দূর করা, সত্যকে জানা এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য জ্ঞান অর্জন করে। তাই ইলম অর্জনের শুরুতেই নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা, নিয়তকে সংশোধন করা এবং সর্বদা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে উদ্দেশ্যকে বিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য। বিশুদ্ধ নিয়তই ইলমে বরকত আনে এবং জ্ঞানকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের মাধ্যম বানায়।

দ্বীনী ইলম আল্লাহ তাআলার এক মহান নেয়ামত এবং মুসলিম জীবনের সঠিক পথনির্দেশক। এই ইলম অর্জনের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত হলেও তা অর্জনের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। আলিমদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ, বিশুদ্ধ নিয়ত, আদব, আমল এবং ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত ইলমই মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে।

পক্ষান্তরে অযোগ্য ব্যক্তির ব্যাখ্যা, স্বশিক্ষিত ফতোয়াবাজি এবং কেবল ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভরতা মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।তাই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো সহীহ পদ্ধতিতে দ্বীনী ইলম অর্জন করা এবং সেই ইলম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

ইলম অর্জনে অবস্যই যোগ্য আলেমদের থেকে ইলম জ্ঞান অর্জন করা আব্যশক । দ্বীনী ক্ষেত্রেও কোন বিষয় কার নিকট থেকে গ্রহণ করার সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া কাম্য। মনে রাখতে হবে, ওয়ায়েজ বা আলোচক মাত্রই বিজ্ঞ-আলিম ও ফকীহ হওয়া অনিবার্য নয়। সুতরাং কোনো কুশলী আলোচকের সুন্দর উপস্থাপনার কারণে আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উদাসীন হওয়ার সুযোগ নেই

ইলম অর্জনে ধৈর্য ও ত্যাগ

ইলম অর্জনের পথ সহজ নয়। এর জন্য সময়, পরিশ্রম ও ধৈর্যের প্রয়োজন। নবী–রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী আলেমগণ জ্ঞান অর্জনের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। কেউ দীর্ঘ সফর করেছেন, কেউ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সহ্য করেছেন।
ধৈর্য ছাড়া ইলম অর্জন সম্ভব নয়। কারণ জ্ঞান ধীরে ধীরে অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করে ইলম অর্জন করে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা লাভ করে।

ইলম অর্জনের পথ ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং ত্যাগের পথ। এই পথে কষ্ট আছে, কিন্তু সেই কষ্টের ফল অত্যন্ত মধুর। যারা ধৈর্যের সঙ্গে ইলম অর্জন করেন, আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তাদের দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন এবং আখিরাতে তাদের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত রাখেন। একজন ইলম অন্বেষণকারীর উচিত প্রতিকূলতাকে ভয় না করে দৃঢ় সংকল্প, ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে ইলম অর্জনের পথে অটল থাকা।

একজন ত্বলিবে ইলম অর্জনের জন্য অনেক সময় নিজের আরাম, অবসর এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে হয়। একজন ছাত্রকে নিয়মিত পড়াশোনা, মুতালাআ, মুখস্থকরণ এবং শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণে সময় ব্যয় করতে হয়। যে ব্যক্তি সময়ের মূল্য বোঝে এবং তা ইলমের জন্য উৎসর্গ করে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলতা লাভ করে।

ইলম এমন একটি সম্পদ, যা একদিনে অর্জন করা যায় না। এর জন্য দীর্ঘ সময় অধ্যয়ন, বারবার পুনরাবৃত্তি, শিক্ষকদের সান্নিধ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা প্রয়োজন। অনেক সময় কোনো বিষয় বুঝতে কষ্ট হয়, মুখস্থ করতে সমস্যা হয় বা নানা প্রতিকূলতা সামনে আসে। কিন্তু ধৈর্য ধারণ করে চেষ্টা চালিয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা ইলমের দরজা খুলে দেয়।
একজন বিখ্যাত তাবিঈ বলেছেন –

لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجَسَدِ

“শরীরের আরাম-আয়েশের মাধ্যমে ইলম অর্জন করা যায় না।”

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ইলম অর্জনের জন্য কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং আরাম-প্রিয়তা পরিহার করতে হয়। ইসলামের ইতিহাসে আলেমগণের জীবন ধৈর্য ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে ভরপুর। ইমাম আল- বুখারী হাদিস সংগ্রহের জন্য হাজার হাজার মাইল সফর করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইলম ও সত্যের উপর অটল থাকার কারণে কারাবরণ ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। ইমাম আল- শাফীঈ, দারিদ্র্যের মধ্যেও ইলম অর্জনের সাধনা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁদের এসব ত্যাগ আজও ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য অনুপ্রেরণা।

ইলম এমন একটি সম্পদ যা একদিনে অর্জন করা যায় না। ধীরে ধীরে বুঝ, পুনরাবৃত্তি, অনুশীলন এবং সময় দিয়ে তা অর্জন করতে হয়। অনেক সময়—
একই বিষয় বারবার পড়তে হয়
কঠিন বিষয় বুঝতে সময় লাগে
ভুল থেকে শিখতে হয়
ধীরে ধীরে স্মরণশক্তি গড়ে ওঠে
এই কারণে ধৈর্য ছাড়া ইলম অর্জন সম্ভব নয়।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم

“আর আপনি নিজেকে তাদের সাথে ধরে রাখুন যারা তাদের রবকে ডাকে...”
— (সূরা আল-কাহফ: ২৮)

ইলম অর্জনের জন্য অনেক সময় নিজের আরাম, অবসর এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে হয়। একজন ত্বলিবে ইলম নিয়মিত পড়াশোনা, মুতালাআ, মুখস্থকরণ এবং শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণে সময় ব্যয় করতে হয়

ধৈর্যশীল ইলম অন্বেষণকারী ব্যক্তি একসময় জ্ঞানের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। তার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয়, সমাজ আলোকিত হয় এবং সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান লাভ করে। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সম্পর্কে বলেন—

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত প্রতিদান দেওয়া হবে।”
(সূরা আল যুমার আয়াত- ১০)

সালাফে সালেহিন ইলম অর্জনের জন্য বছরের পর বছর কষ্ট করেছেন। তাঁরা দীর্ঘ সফর করেছেন, ক্ষুধা সহ্য করেছেন, রাত জেগে অধ্যয়ন করেছেন এবং কখনো হতাশ হননি। তাঁদের এই ধৈর্য ও একাগ্রতার কারণেই আজ তাদের ইলমের আলো সমগ্র উম্মাহ উপভোগ করছে।

ইলম অর্জনের প্রতিবন্ধকতা ও তার সমাধান

ইলম অর্জনের পথে বিভিন্ন বাধা আসে। যেমন—অলসতা, সময়ের অপচয়, খারাপ সঙ্গ, দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি এবং অহংকার। এসব কারণে মানুষ জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে সরে যায়।এসব সমস্যার সমাধান হলো—সময়কে মূল্য দেওয়া, নেককারদের সঙ্গ গ্রহণ করা, নিয়মিত পড়াশোনা করা এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আন্তরিকতা ও পরিশ্রম থাকলে আল্লাহ ইলম অর্জনের পথ সহজ করে দেন।

ইলম অর্জন ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি ইবাদত হলেও বাস্তব জীবনে এটি সহজ কোনো পথ নয়; বরং এই পথে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা বাধা সামনে আসে, যা একজন শিক্ষার্থীকে পিছিয়ে দেয় বা ইলম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এসব প্রতিবন্ধকতা কখনো মানুষের নিজের ভেতর থেকে আসে, যেমন অলসতা, ধৈর্যের অভাব, নিয়তের দুর্বলতা ও গুনাহের অভ্যাস; আবার কখনো বাহ্যিক পরিবেশ থেকে আসে, যেমন খারাপ সঙ্গ, পারিবারিক চাপ, দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি এবং সময়ের অপব্যবহার।

অনেক সময় একজন মানুষ ইলম অর্জন শুরু করলেও নিয়মিততা ধরে রাখতে না পারায় মাঝপথে থেমে যায়, কারণ সে ধৈর্য ধরে কষ্ট সহ্য করতে পারে না। ইলম অর্জন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, যেখানে বারবার পড়া, বুঝা, ভুল সংশোধন করা এবং সময় দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হয়; কিন্তু ধৈর্যের অভাব থাকলে মানুষ দ্রুত ফল চায় এবং সহজেই হতাশ হয়ে পড়ে, ফলে সে আর সামনে এগোতে পারে না। আবার অনেকের ক্ষেত্রে নিয়তের দুর্বলতা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যখন ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি না হয়ে দুনিয়ার লাভ, প্রশংসা বা সামাজিক মর্যাদা হয়, তখন সেই ইলমে বরকত থাকে না এবং অন্তর থেকে আগ্রহও কমে যায়।

একইভাবে খারাপ সঙ্গ ইলম অর্জনের পথে বড় ক্ষতির কারণ হয়, কারণ খারাপ বন্ধু বা পরিবেশ মানুষকে অপ্রয়োজনীয় আড্ডা, সময় নষ্ট এবং গাফিলতির দিকে নিয়ে যায়, যা ধীরে ধীরে পড়াশোনার আগ্রহ কমিয়ে দেয়। দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসাও ইলম অর্জনের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা, কারণ যখন মানুষ অর্থ, চাকরি, বিনোদন এবং আরাম-আয়েশকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তখন দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও মনোযোগ দিতে পারে না। পাশাপাশি গুনাহ ও পাপ কাজ মানুষের

অন্তরকে অন্ধকার করে দেয়, ফলে ইলম গ্রহণ ও বুঝার ক্ষমতা কমে যায় এবং অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি হয়।

আবার কিছু মানুষ সময় ব্যবস্থাপনার অভাবে পড়াশোনার জন্য পর্যাপ্ত সময় বের করতে পারে না, কারণ তারা অযথা মোবাইল ব্যবহার, সোশ্যাল মিডিয়া বা অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করে ফেলে। এর সাথে অহংকার ও আত্মতৃপ্তিও একটি বড় বাধা, কারণ যে ব্যক্তি মনে করে সে সব জানে বা আর কিছু শেখার প্রয়োজন নেই, সে নতুন জ্ঞান গ্রহণের দরজা নিজেই বন্ধ করে দেয়। এছাড়া অনেক সময় পারিবারিক ও সামাজিক চাপও ইলম অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে যখন পরিবার দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে না বা অর্থনৈতিক কারণে শিক্ষার্থীর ওপর অন্য কাজের চাপ সৃষ্টি করে। এই সব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দৃঢ় নিয়ত, ধৈর্য, পরিশ্রম এবং নিয়মিত চেষ্টা ধরে রাখতে পারে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য ইলম অর্জনের পথ সহজ করে দেন এবং তার জন্য হেদায়েত ও সফলতার দরজা খুলে দেন।

ইলম অর্জনের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা সামনে আসে, সেগুলো দূর করার জন্য ইসলাম সুন্দর ও বাস্তবসম্মত সমাধান দিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরের সংশোধন, সঠিক নিয়ত এবং আল্লাহর উপর ভরসা। যখন একজন ছাত্র নিজের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ধারণ করে, তখন তার অন্তরে বরকত আসে এবং আল্লাহ তার জন্য ইলমের পথ সহজ করে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। তাই প্রথম সমাধান হলো নিয়তকে বারবার ঠিক করা এবং ইলমকে দুনিয়াবি লাভের জন্য নয়, বরং আখিরাতের মুক্তির জন্য শেখা।

ইলম একদিনে অর্জন করা যায় না; বরং এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। তাই প্রতিদিন অল্প হলেও নিয়মিত পড়াশোনা করা, বারবার পুনরাবৃত্তি করা এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে লেগে থাকে, আল্লাহ তার জন্য কঠিন বিষয়গুলো সহজ করে দেন। পাশাপাশি সময় ব্যবস্থাপনা খুব গুরুত্বপূর্ণ; অপ্রয়োজনীয় কাজ, মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়া কমিয়ে পড়াশোনার জন্য নির্দিষ্ট সময় ঠিক করতে হবে। নিয়মিত রুটিন তৈরি করলে ইলম অর্জন অনেক সহজ হয়।

ভালো সঙ্গ নির্বাচন করা। ভালো বন্ধু মানুষকে ইলমের পথে উৎসাহিত করে, আর খারাপ সঙ্গ মানুষকে গাফিলতির দিকে নিয়ে যায়। তাই এমন পরিবেশে থাকা উচিত

যেখানে সবাই দ্বীনি জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী এবং একে অপরকে উৎসাহ দেয়। আলেম ও উস্তাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের দিকনির্দেশনা ছাড়া অনেক সময় সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়।

গুনাহ থেকে দূরে থাকা। গুনাহ মানুষের অন্তরকে অন্ধকার করে দেয় এবং ইলমের নূর নষ্ট করে দেয়। তাই চোখ, কান, জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। নামাজ, তাওবা ও দোয়ার মাধ্যমে অন্তরকে পবিত্র রাখলে ইলম গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।অহংকার ও আত্মতৃপ্তি দূর করা। একজন তালিবুল ইলমকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে সে এখনো শিক্ষার্থী, তার শেখা শেষ হয়নি। বিনয়ী হলে আল্লাহ তার ইলম বাড়িয়ে দেন এবং মানুষের কাছ থেকেও সে উপকার পায়।

সবচেয়ে বড় সমাধান হলো আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। প্রতিদিন দোয়া করা—"হে আল্লাহ, আমাকে উপকারী ইলম দান করুন"—এবং ইলম অর্জনকে ইবাদতের অংশ হিসেবে মনে করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, নিয়মিত চেষ্টা করে এবং সঠিক পথে থাকে, আল্লাহ তার জন্য ইলম অর্জনকে সহজ করে দেন এবং তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করেন।

তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধিতে ইলমের গুরুত্ব

তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি—এই দুটি বিষয় একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই লক্ষ্য দুটি অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয় সঠিক দ্বীনি ইলম ছাড়া। কারণ মানুষ জন্মগতভাবে জানে না কোনটি আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ আর কোনটি অসন্তুষ্টির কারণ। এই পার্থক্য বুঝার একমাত্র মাধ্যম হলো ইলম। তাই ইলম শুধু একটি জ্ঞান নয়; বরং এটি তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির ভিত্তি এবং পথনির্দেশক শক্তি।

তাকওয়া শব্দটি আরবি "وَقَى" (ওয়াকা) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো বাঁচানো, রক্ষা করা বা ঢালস্বরূপ কোনো কিছু গ্রহণ করা। ইসলামী পরিভাষায় তাকওয়া বলতে বোঝায়—আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও সচেতনতার কারণে তাঁর আদেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ এমনভাবে জীবন পরিচালনা করা, যাতে মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও আখিরাতের শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।
হযরত আলী রা. তাকওয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন—
"তাকওয়া হলো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে ভয় করা, কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।"

তাকওয়া শুধু বাহ্যিক আমলের নাম নয়; বরং এটি অন্তরের এমন একটি গুণ, যা মানুষের চিন্তা, চরিত্র, কথা ও কর্মকে আল্লাহমুখী করে তোলে।

দ্বীনি ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে। মানুষ যখন আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে জানে, তখন সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। এভাবেই ইলম আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকওয়া বৃদ্ধি করে। পবিত্র কুরআন মাজিদে আছে যে-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই তাঁকে যথার্থ ভয় করে।"
(সূরা ফাতির — আয়াত: ২৮)

তাকওয়া ও অবলম্বন করার মূল ভিত্তি হলো দ্বীনি ইলম.ইলম অর্জন না করলে মানুষ জানতে পারবে নির্দেশসমূহ,না জেনে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করতে পারবে না। কোন কাজ হালাল, কোনটি হারাম; কোনটি ফরজ, কোনটি নফল; কোন কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন আর কোন কাজ অপছন্দ করেন—এসব জানার একমাত্র মাধ্যম হলো **দ্বীনি ইলম।**

ইলম মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেয়, গুনাহ থেকে সতর্ক করে, নফসের রোগ দূর করে এবং উত্তম চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত দ্বীনি ইলম অর্জনের মাধ্যমে নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা এবং তাকওয়ার জীবন গড়ে তোলা।

প্রকৃত আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার মূল ভিত্তি হলো ইলম। মানুষ যত বেশি আল্লাহকে জানবে, তাঁর মহিমা, ক্ষমতা ও বিধান সম্পর্কে অবগত হবে, ততই তার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। ফলে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার এবং নেক আমল করার চেষ্টা করবে।

ইলম হলো পথের আলো, আর তাকওয়া হলো সেই আলোর অনুসরণ করে সঠিক পথে চলা। ইলম মানুষকে সত্য চিনিয়ে দেয়, আর তাকওয়া তাকে সেই সত্যের ওপর অটল রাখে। ইলমহীন ইবাদত মানুষকে ভুলের মধ্যে ফেলতে পারে, আবার আমলহীন ইলমও মানুষের উপকারে আসে না। এজন্য সালাফে সালিহীনগণ ইলম ও তাকওয়াকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে গণ্য করেছেন।

তাকওয়া অর্জনের জন্য কোন কাজ আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং কোন কাজ অপছন্দনীয়—তা জানা অপরিহার্য। এই জ্ঞান কেবল দ্বীনি ইলমের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। ইলম মানুষকে হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ও সুন্নাহ-বিদআতের পার্থক্য শেখায়। ফলে সে সচেতনভাবে নিজের জীবন পরিচালনা করতে পারে এবং আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হয়।

আত্মাশুদ্ধি বা তাযকিয়াতুন নফসের ক্ষেত্রেও ইলমের ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের অন্তরে অহংকার, হিংসা, রিয়া (লোক দেখানো), লোভ, ক্রোধ ও কুপ্রবৃত্তির মতো নানা রোগ বিদ্যমান থাকে। এখানে ইলম মানুষের জন্য এক ধরনের আয়না হিসেবে কাজ করে, যা তাকে নিজের ভেতরের অবস্থা চিনতে সাহায্য করে এবং ধীরে ধীরে নিজেকে সংশোধনের দিকে নিয়ে যায়।

ইলম মানুষকে তার ভুল ও গুনাহ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যখন একজন ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করে, তখন সে বুঝতে পারে কোন আচরণ আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় এবং কোন গুণগুলো মানুষের অন্তরকে নষ্ট করে দেয়। এই জ্ঞান তাকে নিজের জীবন পর্যালোচনা করতে শেখায় এবং ধীরে ধীরে সে তাওবা, ইস্তিগফার ও নেক আমলের দিকে ফিরে আসে। ফলে তার অন্তর নরম হয়, হৃদয়ে আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পায় এবং পাপের প্রতি ঘৃণা জন্ম নেয়।

আত্মশুদ্ধির পথে ইলম মানুষের চরিত্রকে পরিবর্তন করে দেয়। আগে যে ব্যক্তি অহংকারী, রাগী বা উদাসীন ছিল, ইলম অর্জনের মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে বিনয়ী, ধৈর্যশীল এবং দায়িত্বশীল মানুষে পরিণত হয়। ইলম তাকে শেখায় যে প্রকৃত সফলতা বাহ্যিক সম্মান নয়, বরং অন্তরের পবিত্রতা। এই উপলব্ধি তাকে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শক্তি দেয়, যা আত্মশুদ্ধির মূল অংশ।

দ্বীনি ইলম এসব আত্মিক রোগ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে এবং সেগুলো থেকে মুক্তির পথ দেখায়। যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজের আত্মাকে পর্যালোচনা করে, সে ধীরে ধীরে নিজের চরিত্র ও আচরণকে সংশোধন করতে সক্ষম হয়।

আত্মশুদ্ধি মানুষের প্রকৃত সফলতার অন্যতম প্রধান শর্ত।ইমাম আল-গাযালী রহ. বলেছেন, “ইলম ছাড়া আমল অন্ধ, আর আমল ছাড়া ইলম ফলহীন।” অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির জন্য শুধু ইবাদত করাই যথেষ্ট নয়; বরং ইবাদতকে সঠিকভাবে পালন এবং তার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার জন্য ইলম প্রয়োজন। ইলমই মানুষকে নিজের দোষত্রুটি চিনতে এবং তা সংশোধন করতে সাহায্য করে।

আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ হলো নিজের রোগ ও ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করা। আর তা সম্ভব হয় দ্বীনি ইলমের মাধ্যমে। যে ব্যক্তি জানেই না অহংকার কী, রিয়া কী, হিংসা কত বড় গুনাহ, বা ইখলাসের মর্যাদা কত, সে কীভাবে নিজের আত্মাকে সংশোধন করবে?
দ্বীনি ইলম মানুষের জন্য আয়নার মতো কাজ করে। এটি মানুষকে তার অন্তরের দুর্বলতা ও ভুলগুলো দেখিয়ে দেয়। কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করলে মানুষ বুঝতে পারে কোন কাজ আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং কোন কাজ তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ। ফলে সে নিজেকে সংশোধনের সুযোগ পায়।
ইমাম মালিক রহ. বলেছেন—
"যে ব্যক্তি ইলম অর্জন না করে তাসাউফ (আত্মশুদ্ধির চর্চা) করে, সে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় থাকে; আর যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি ছাড়া শুধু ইলম অর্জন করে, সে ফাসিক হওয়ার আশঙ্কায় থাকে। যে উভয়টিকে একত্র করে, সে-ই সফল হয়।"

দ্বীনি ইলম মানুষের অন্তরে আখিরাতের চিন্তা জাগ্রত করে। যখন একজন মানুষ জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার বিষয়গুলো সম্পর্কে জানে, তখন তার হৃদয়ে তাকওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। সে গুনাহ থেকে দূরে থাকার এবং আল্লাহর আনুগত্যে জীবন পরিচালনার চেষ্টা করে। এভাবেই ইলম মানুষকে আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর করে।

সালাফে সালিহীনগণ ইলমকে আত্মার খাদ্য বলে অভিহিত করেছেন। যেমন শরীর খাদ্য ছাড়া দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনি আত্মাও ইলম ছাড়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। দ্বীনি ইলম হৃদয়কে জীবন্ত রাখে, ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করে।

আত্মশুদ্ধির প্রকৃত ফল হলো তাকওয়া, আর তাকওয়ার ভিত্তি হলো ইলম। ইলম মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেয়, আখিরাতের কথা স্মরণ করায় এবং হৃদয়কে গাফেলত থেকে জাগ্রত করে।

আত্মশুদ্ধি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কিন্তু সঠিক ইলম ছাড়া আত্মশুদ্ধির পথ সুস্পষ্ট হয় না। দ্বীনি ইলম মানুষকে নিজের অন্তরের রোগ চিনতে শেখায়, সেগুলো

দূর করার উপায় জানায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে। তাই যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চায়, তার জন্য কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক দ্বীনি ইলম অর্জন করা অপরিহার্য।

ইলম হলো তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির মূল চাবিকাঠি। এটি মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, তাকে সঠিক পথ দেখায় এবং ধীরে ধীরে একজন পরিশুদ্ধ ও আল্লাহভীরু মানুষে পরিণত করে। তাই যে ব্যক্তি তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে চায়, তার জন্য প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দ্বীনি ইলম অর্জন করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা।

ইলমে দ্বীনের ফযিলত ও প্রয়োজনীয়তা

ইলমের অন্যতম বড় ফযিলত হলো এটি মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেন।" এই ইলম শুধু দুনিয়াতে সম্মানই আনে না, বরং আখিরাতেও উচ্চ মর্যাদা দান করে। একজন আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষের জন্য হেদায়েতের পথপ্রদর্শক হন; তিনি মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য শেখান এবং সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। ইলম মানুষের অন্তরকে নরম করে, তাকে বিনয়ী বানায় এবং অহংকার থেকে দূরে রাখে, কারণ প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

ইলম শুধু ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের পুরো জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও সুন্দরভাবে পরিচালিত করার একটি মাধ্যম। ইলম মানুষকে হালাল ও হারামের পার্থক্য শেখায়, যার ফলে সে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ব্যবসা, লেনদেন, পারিবারিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ—সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে, ফলে সে গুনাহ থেকে দূরে থাকে এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহী হয়। ধীরে ধীরে তার চরিত্র উন্নত হয়, সে বিনয়ী ও ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠে এবং সমাজে একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়। শুধু তাই নয়, দ্বীনি ইলম একটি সমাজকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্যায় থেকে মুক্ত করে সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দ্বীনি ইলম এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান, যা মানুষের অন্তরকে ঈমানের আলোয় ভরিয়ে দেয় এবং তার জীবনকে আল্লাহর নির্দেশনার অধীনে পরিচালিত করে। একজন মানুষ যখন কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, তখন সে শুধু কিছু নিয়ম-কানুন শেখে না; বরং সে জীবনের উদ্দেশ্য, সৃষ্টির রহস্য এবং আখিরাতের প্রস্তুতির সঠিক পথ জানতে পারে। এই ইলম মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনে এবং তাকে দুনিয়ার মোহ থেকে আখিরাতমুখী করে তোলে।

দ্বীনি ইলম অর্জন মানুষকে সঠিক আকিদা ও আমল শিক্ষা দেয়। এটি ছাড়া ইসলামকে সঠিকভাবে বোঝা ও পালন করা সম্ভব নয়। ইলম মানুষের জীবনকে সুন্দর করে এবং আখিরাতের সফলতার পথ দেখায়।ইলম সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। ইলমের মাধ্যমে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য জানতে পারে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজ থেকে কুসংস্কার, অন্যায় ও অজ্ঞতা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।যখন সমাজে ইলম বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষের চরিত্র ও আচরণ সুন্দর হয় এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইলম মানুষের ভেতরে আত্মশুদ্ধির একটি গভীর ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু করে, যা ধীরে ধীরে তার পুরো জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়। যখন একজন মানুষ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করে, তখন সে শুধু বাহ্যিক জ্ঞানই লাভ করে না; বরং তার অন্তরের আয়নায় নিজের বাস্তব চিত্রও দেখতে পায়। সে বুঝতে পারে তার কোন কাজগুলো ভুল, কোন অভ্যাসগুলো দুর্বলতা এবং কোন আচরণগুলো গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এই উপলব্ধি তার মধ্যে আত্মসমালোচনার মানসিকতা তৈরি করে, ফলে সে নিজের জীবনকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। ধীরে ধীরে তার অন্তর থেকে গাফিলতি দূর হতে থাকে এবং সে আল্লাহর প্রতি আরও বেশি সচেতন হয়ে ওঠে।

ইলমের আলো মানুষের চরিত্রে পরিবর্তন আনে এবং তার ভেতরের কঠোরতা কমিয়ে দেয়। আগে যে অন্তর গুনাহের প্রতি উদাসীন ছিল, ইলম অর্জনের পর সেই অন্তর ধীরে ধীরে নরম হয়ে যায় এবং আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষ তখন নিজের ভুলকে স্বীকার করতে শেখে, তাওবার দিকে ফিরে আসে এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহী হয়। এই পরিবর্তনের ফলে তার আচার-আচরণ, কথা-বার্তা এবং সামাজিক সম্পর্কেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। সে ধীরে ধীরে একজন ন্যায়পরায়ণ, বিনয়ী এবং দায়িত্বশীল মানুষে পরিণত হয়।

এই আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া একজন মুমিনের প্রকৃত সফলতার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; বরং সেই জ্ঞানকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। যখন একজন মানুষ নিজের ভেতরের খারাপ গুণগুলো দূর করে ভালো গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, তখনই তার ইলম সত্যিকারের ফল দেয়। এভাবেই দ্বীনি ইলম মানুষকে বাহ্যিকভাবে জ্ঞানী এবং অভ্যন্তরীণভাবে পরিশুদ্ধ মানুষে পরিণত করে, যা দুনিয়া ও আখিরাতে তার সফলতার পথকে সহজ করে দেয়।

ইলম মানুষকে শয়তানের ধোঁকা ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে। শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে ভুল পথে নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান রাখে, সে সহজে ভুল ও সঠিকের পার্থক্য বুঝতে পারে। ইলম তার জন্য একটি শক্ত ঢাল হিসেবে কাজ করে, যা তাকে গুনাহ, কুসংস্কার এবং বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে। এজন্য বলা যায়, ইলম হলো হেদায়েতের আলো এবং নিরাপত্তার মাধ্যম।

ইলম শুধু বাহ্যিক দিক থেকেই নয়, বরং মানুষের অন্তরের ভেতরেও পরিবর্তন আনে। যখন একজন মানুষ ইলম অর্জন করে, তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পায়, বিবেক জাগ্রত হয় এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়। ফলে শয়তান যতই চেষ্টা করুক না কেন, সে আর সহজে তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। ইলম তার জন্য এমন এক আত্মিক শক্তি তৈরি করে, যা তাকে স্থির রাখে এবং বারবার তাওবার দিকে ফিরিয়ে আনে।

দ্বীনি ইলম সমাজে নেতৃত্বের যোগ্যতা তৈরি করে এবং একজন মানুষকে কেবল ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞানীই বানায় না, বরং তাকে সমাজের জন্য দিকনির্দেশক ও পথপ্রদর্শকে পরিণত করে।

একজন আলেম বা প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু নিজের ইবাদত ও আমল নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না; বরং তিনি পুরো সমাজের অবস্থার প্রতি সচেতন থাকেন এবং মানুষের সমস্যাগুলো বুঝে সঠিক সমাধানের চেষ্টা করেন। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন, বিভ্রান্তি দূর করেন এবং হকের পথ স্পষ্ট করে দেন। ফলে সাধারণ মানুষ যখন কোনো বিষয়ে দ্বিধা বা সমস্যায় পড়ে, তখন তারা এমন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে ফিরে যায়, যিনি তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করেন।

ইলম মানুষের মধ্যে বিচার-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি জটিল সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। একজন প্রকৃত আলেম সমাজে শুধু ধর্মীয় বিধানই ব্যাখ্যা করেন না, বরং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি অন্যায়, অবিচার ও কুসংস্কারের

বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং মানুষকে সচেতন করেন, যাতে সমাজে ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে মানুষ ভুল পথে যাওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং একটি সুশৃঙ্খল জীবনধারার দিকে অগ্রসর হয়।

ইলম অর্জনে দুনিয়া ও আখিরাতের ফযিলত

ইলম মানুষকে দুনিয়ায় সম্মানিত করে এবং আখিরাতে জান্নাতের পথ সহজ করে দেয়। জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজে মর্যাদা লাভ করেন এবং মানুষের উপকার করতে পারেন। অন্যদিকে আখিরাতে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানীদের বিশেষ প্রতিদান দান করবেন।দ্বীনি ইলম এমন একটি সম্পদ যা মৃত্যুর পরও মানুষের উপকারে আসে।ইলম মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র হন। মানুষ তার পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তাকে অনুসরণ করে।ইলম মানুষকে হক ও বাতিল, সঠিক ও ভুল, উপকারী ও ক্ষতিকর বিষয় পার্থক্য করার যোগ্যতা প্রদান করে। ফলে সে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নানা ধরনের বিপদ ও ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

ব্যাক্তি বা পারিবারিক জীবনে দ্বীনি ইলম মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান থাকার ফলে পরিবারে শান্তি, সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। অনেক পারিবারিক সমস্যার মূল কারণ হলো অজ্ঞতা; ইলম সেই অজ্ঞতা দূর করে।

ইলম মানুষের অন্তর্দৃষ্টি (বসীরত) বৃদ্ধি করে এবং সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল, উপকারী-অপকারী বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা দান করে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আবেগ, কুসংস্কার বা অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত—সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ইলম অপরিহার্য। দ্বীনি ইলম মানুষকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চিন্তা ও কাজ করতে শেখায়, ফলে সে অনেক ভুল, অনুতাপ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন, “যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে না, সে নিজের মতামতের উপর নির্ভর করে; আর যে ব্যক্তি নিজের মতামতের উপর নির্ভর করে, সে ভুল করার ঝুঁকিতে থাকে।” তাই ইলম মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে, দূরদর্শিতা বৃদ্ধি করে এবং তাকে সঠিক পথ নির্বাচন করতে সাহায্য করে। বর্তমান যুগের নানা ফিতনা, বিভ্রান্তি ও মতপার্থক্যের মাঝে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দ্বীনি ইলমের বিকল্প নেই।

দ্বীনি ইলম মানুষের রিজিক ও উপার্জনে বরকত আনার অন্যতম মাধ্যম। ইলম মানুষকে হালাল-হারামের জ্ঞান দান করে, যার ফলে সে বৈধ ও পবিত্র উপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে। হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা এবং হালাল রিজিকের অনুসন্ধান করা একজন মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য ইলম অপরিহার্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।" — সূরা আত-তালাক: ২-৩

দ্বীনি ইলম মানুষকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করে, আর তাকওয়া রিজিকে বরকত লাভের অন্যতম কারণ। অনেক সময় সামান্য উপার্জনেও ইলম ও তাকওয়ার কারণে এমন বরকত হয় যে তা মানুষের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে অজ্ঞতার কারণে মানুষ হারাম বা সন্দেহযুক্ত উপার্জনে জড়িয়ে পড়ে, যা বাহ্যিকভাবে বেশি মনে হলেও প্রকৃত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে।

ইলম মানুষকে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর সন্তুষ্টির পথ এবং আখিরাতের সফলতার উপায় শিক্ষা দেয়। ফলে ইলম অর্জনকারী ব্যক্তি শুধু নিজেই উপকৃত হন না; বরং অন্যদের জন্যও হিদায়াতের মাধ্যম হয়ে ওঠে। ইলম অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফযিলত হলো, এর মাধ্যমে জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যায়ইলম মানুষকে সঠিক আমল, বিশুদ্ধ আকীদা এবং আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে। যত বেশি একজন ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবেন, ততই তার জন্য নেক আমলের পথ সুগম হবে এবং আখিরাতে সফলতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

দ্বীনি ইলমের মর্যাদা এতটাই মহান যে, আল্লাহর ফেরেশতারাও ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"নিশ্চয়ই ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।" ("সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৬৪১)

ফেরেশতাদের ডানা বিছিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো, তারা ইলম শিক্ষার্থীর প্রতি সম্মান, ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এটি এমন এক মর্যাদা, যা খুব কম মানুষই লাভ করতে পারে। আসমান ও জমিনের সৃষ্টিজগতের পক্ষ থেকেও ইলম অর্জনকারীর জন্য কল্যাণের দোয়া করা হয়।

ইলম মানুষকে জাহান্নামের পথ থেকে রক্ষা করে এবং মুক্তির পথ দেখায়। অজ্ঞতা মানুষকে গুনাহ, বিদআত ও বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয়; পক্ষান্তরে ইলম তাকে সঠিক পথের দিশা দেয়। কিয়ামতের দিন ইলম এবং ইলম অনুযায়ী করা আমল মানুষের জন্য নাজাতের কারণ হবে।অনেক আলেম বলেছেন, ইলম এমন এক নূর যা মানুষকে দুনিয়ায় হিদায়াত এবং আখিরাতে মুক্তির দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম অর্জন করে, তা অনুযায়ী আমল করে এবং অন্যদের শেখায়, সে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার অধিক হকদার হয়ে ওঠে। ইলম মানুষকে এমন আমলের দিকে পরিচালিত করে, যা কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ ও সফলতার কারণ হবে।

মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর সাধারণত তার আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কিছু আমল মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়; তবে তিনটি জিনিস ব্যতীত— সাদাকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।”

(সহিহ মুসলিম , হাদিস নং ১৬৩১)

উপকারী ইলম এমন এক সাদাকায়ে জারিয়া, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। একজন ব্যক্তি যদি মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেন, দ্বীনি বই রচনা করেন, কোনো শিক্ষার্থীকে ইলম শেখান বা দ্বীনি শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখেন, তবে যতদিন মানুষ সেই ইলম থেকে উপকৃত হবে ততদিন তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকবে।

ব্যক্তি জীবনে ইলমের প্রয়োজনীয়তা

একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ইলম প্রয়োজন। নামাজ, রোজা, লেনদেন, পারিবারিক জীবন—সবকিছুতেই ইসলামের জ্ঞান প্রয়োজন হয়। ইলম ছাড়া মানুষ সহজেই ভুল ও গুনাহে জড়িয়ে পড়ে।
তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত অন্তত প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা।

ফরজ ইবাদত পালন ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে সব ইলমের মর্যাদা এক নয়। কিছু ইলম এমন আছে যা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অর্জন করা অপরিহার্য। এই ইলমকে বলা হয় ফরয ইলম বা ফরযে আইন ইলম। অর্থাৎ যে জ্ঞান অর্জন না করলে একজন মুসলিম তার মৌলিক ধর্মীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। ব্যক্তি জীবনে সঠিক ঈমান, বিশুদ্ধ ইবাদত, উত্তম চরিত্র এবং হালাল-হারামের বিধান জানার জন্য ফরয ইলম অর্জন অপরিহার্য।

মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ইলম ছাড়া সঠিকভাবে ইবাদত করা সম্ভব নয়। নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ, পবিত্রতা, হালাল-হারাম, লেনদেন ও পারিবারিক জীবনের বিধান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকলে মানুষ অজ্ঞতাবশত ভুল ও গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। তাই ফরয ইলম মানুষের ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ।
ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন—
"العلم قبل القول والعمل" অর্থাৎ "কথা ও কাজের পূর্বে ইলম।" এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সঠিক জ্ঞান ছাড়া কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিশ্চয়তা নেই। কারণ মানুষ তখনই সঠিকভাবে আমল করতে পারবে যখন সে আমলের বিধান সম্পর্কে অবগত থাকবে।

ফরয ইলম মানুষের ঈমানকে দৃঢ় ও বিশুদ্ধ রাখে। আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষকে শিরক, কুসংস্কার, বিদআত ও বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই আল্লাহ,

রাসূল ﷺ, আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও তাকদীর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া কোনো আমলের মূল্য থাকে না।

ব্যক্তি জীবনে ফরয ইলমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো হালাল ও হারামের জ্ঞান অর্জন। একজন ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের মাসআলা জানা জরুরি, একজন চাকরিজীবীর জন্য তার পেশাসংক্রান্ত শরয়ী বিধান জানা জরুরি এবং একজন স্বামী-স্ত্রীর জন্য পারিবারিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। কারণ মানুষ যে অবস্থায় থাকে, সে অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধান জানা তার জন্য ফরয হয়ে যায়।

ফরয ইলম চরিত্র গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, ধৈর্য, বিনয়, তাকওয়া, পিতা-মাতার আনুগত্য এবং মানুষের হক আদায়ের শিক্ষা ইলমের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। ফলে একজন ব্যক্তি শুধু ইবাদতগুজার নয়, বরং আদর্শ চরিত্রের অধিকারী মানুষে পরিণত হয়।

সালাফে সালেহীন ফরয ইলমকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, “তোমরা নেতৃত্ব লাভের আগে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন কর।” কারণ ইলম মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে সাহায্য করে।

বর্তমান যুগে নানা ধরনের বিভ্রান্তি, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মতবাদের বিস্তার ঘটেছে। এসব থেকে আত্মরক্ষা করার অন্যতম মাধ্যম হলো ফরয ইলম অর্জন। যে ব্যক্তি দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে, সে সহজে ভ্রান্ত চিন্তা ও অপব্যাখ্যার শিকার হয় না।

ফরয ইলম অর্জন ব্যক্তি জীবনের জন্য অপরিহার্য একটি দায়িত্ব। এটি মানুষকে সঠিক ঈমান, বিশুদ্ধ আমল, উত্তম চরিত্র এবং আল্লাহভীতিসম্পন্ন জীবন গঠনে সহায়তা করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার প্রয়োজনীয় ফরয ইলম অর্জনে সচেষ্ট হওয়া এবং সেই ইলম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কেননা ইলমই মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সফলতার পথে পরিচালিত করে।

মানুষের জীবন প্রতিনিয়ত অসংখ্য কাজ, লেনদেন ও সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে অতিক্রম হয়। একজন মুসলমানের জন্য শুধু কোনো কাজ করা যথেষ্ট নয়; বরং সেই কাজটি

আল্লাহর দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ, হালাল না হারাম—তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর হালাল-হারাম নির্ণয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো দ্বীনি ইলম।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে হালাল ও হারামের বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং মানুষকে বৈধ বিষয় গ্রহণ ও অবৈধ বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এসব বিধান সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে একজন মানুষ অজ্ঞতাবশত হারাম কাজে লিপ্ত হতে পারে। ফলে তার ইবাদত, উপার্জন এবং জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দ্বীনি ইলম মানুষকে খাদ্য, পানীয়, পোশাক, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের সীমারেখা শিক্ষা দেয়। একজন ব্যবসায়ী যদি সুদ, প্রতারণা ও অবৈধ লেনদেনের বিধান না জানে, তাহলে সে সহজেই হারামে জড়িয়ে পড়তে পারে। একইভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও শরীয়তের বিধান জানা অপরিহার্য।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বলতেন, "যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেনি, সে যেন আমাদের বাজারে ব্যবসা না করে।" এর দ্বারা বোঝা যায় যে, হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালনা করা বিপজ্জনক।

হালাল উপার্জন ও হালাল জীবনযাপন মানুষের আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। তাই হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতনতা একজন মুমিনের ঈমান ও তাকওয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

হালাল-হারাম নির্ণয়ের জন্য দ্বীনি ইলম অপরিহার্য। এই জ্ঞান মানুষকে গুনাহ থেকে রক্ষা করে, তার উপার্জন ও জীবনকে পবিত্র রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী হালাল-হারামের বিধান শিক্ষা করা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

উত্তম চরিত্র ও আখলাক গঠনে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম।

মানবজীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য কেবল বাহ্যিক সফলতা বা জাগতিক উন্নতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং উত্তম চরিত্র, সুন্দর আখলাক এবং নৈতিক গুণাবলির মধ্যেই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নিহিত। ইসলাম মানুষের চরিত্র গঠনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। দ্বীনি ইলম মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে এবং তাকে

আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই উত্তম আখলাক গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ দ্বীনি ইলম।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা মানুষের চরিত্র সংশোধনের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন। তিনি বলেছেন—

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য।"
(মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮৯৫২)

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষের চরিত্রকে সুন্দর ও পরিশুদ্ধ করা। আর এই লক্ষ্য অর্জনের প্রধান মাধ্যম হলো দ্বীনি ইলম।

দ্বীনি ইলম মানুষকে আল্লাহভীতি ও জবাবদিহিতার অনুভূতি শিক্ষা দেয়। যখন একজন ব্যক্তি জানতে পারে যে, তার প্রতিটি কথা, কাজ এবং আচরণের হিসাব আল্লাহ তাআলার কাছে দিতে হবে, তখন সে সতর্ক হয়ে যায়। ফলে মিথ্যা, প্রতারণা, গীবত, হিংসা, অহংকার ও অন্যায় আচরণ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। এভাবেই ইলম মানুষের চরিত্রকে শুদ্ধ ও সুন্দর করে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা আল-কলম : ৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর জীবন অধ্যয়ন ও সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে একজন মুসলিম ধৈর্য, বিনয়, ক্ষমাশীলতা, দয়া, সততা ও

ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা লাভ করে। দ্বীনি ইলম মানুষকে এই মহান চরিত্রের আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করে।

উত্তম আখলাক গঠনে দ্বীনি ইলমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো আত্মসংযম শিক্ষা দেওয়া। মানুষ স্বভাবতই বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাগ, লোভ, হিংসা ও অহংকার অনেক সময় তাকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে। কিন্তু দ্বীনি ইলম তাকে শেখায় কীভাবে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হয়। ফলে ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নৈতিক দৃঢ়তা অর্জন করে।

দ্বীনি ইলম পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করতেও সহায়তা করে। ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, প্রতিবেশীর হক আদায়, ছোটদের স্নেহ করা এবং বড়দের সম্মান করার শিক্ষা দিয়েছে। এসব শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি একজন আদর্শ সন্তান, আদর্শ অভিভাবক এবং আদর্শ সমাজসেবী হিসেবে গড়ে ওঠে।

সালাফে সালেহীন ইলম ও আখলাককে অবিচ্ছেদ্য মনে করতেন। তারা বলতেন, "আমরা ইলম শেখার আগে আদব শিখতাম।" কারণ আখলাকবিহীন ইলম মানুষের জন্য উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণও হতে পারে। প্রকৃত আলিম সেই ব্যক্তি, যার জ্ঞান তার চরিত্র, আচরণ ও আমলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

বর্তমান যুগে জ্ঞান ও তথ্যের প্রসার ঘটলেও নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক অশান্তি এবং সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হলো ইলম ও আখলাকের বিচ্ছিন্নতা। মানুষ জ্ঞান অর্জন করছে, কিন্তু সেই জ্ঞান চরিত্র গঠনে কাজে লাগাচ্ছে না। তাই দ্বীনি ইলমের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের প্রতি নতুন করে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।
আকীদা বা বিশ্বাস ইসলামের মূল ভিত্তি। একজন মুসলমানের সকল আমল, ইবাদত ও নৈতিক কর্মকাণ্ডের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তার আকীদার বিশুদ্ধতার উপর। আকীদা যদি শুদ্ধ না হয়, তবে বাহ্যিকভাবে যত আমলই করা হোক না কেন, তা

আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই ইসলামে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হলো সঠিক আকীদা ও ঈমান শিক্ষা।

দ্বীনি ইলম মানুষকে আল্লাহ তাআলা, তাঁর একত্ববাদ, নবী-রাসূলগণ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, আখিরাত এবং তাকদীর সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করে। এই জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি শিরক, কুফর, নিফাক, কুসংস্কার এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। ইলমের অভাবেই মানুষ অনেক সময় অজ্ঞতাবশত এমন বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, যা তার ঈমানের জন্য ক্ষতিকর।

পবিত্র কুরআনের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম মানুষের আকীদা সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। মক্কী জীবনের অধিকাংশ আয়াতে তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাতের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কারণ সঠিক আকীদা ছাড়া ইসলামের অন্য কোনো বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।
সঠিক আকীদা মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি, তাকওয়া ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। সে বুঝতে পারে যে, তার জীবনের সকল বিষয় আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে এবং একদিন তাকে তাঁর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। ফলে তার চরিত্র, আমল এবং জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ, নাস্তিক্যবাদ, কুসংস্কার ও বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার বিস্তার ঘটেছে। এসব বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সহীহ দ্বীনি ইলম অর্জন করা। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নিজের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরয ও অপরিহার্য।

আত্মশুদ্ধি ছাড়া ইলমের পূর্ণ সুফল অর্জন করা সম্ভব নয়। আর সহীহ ইলম ছাড়া আত্মশুদ্ধিও পরিপূর্ণ হয় না। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত বিশুদ্ধ দ্বীনি ইলম অর্জনের মাধ্যমে নিজের অন্তরকে পবিত্র করা, চরিত্রকে উন্নত করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন পরিচালনা করা।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

“নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তাকে কলুষিত করেছে।”

(সূরা আশ-শামস : ৯-১০)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের প্রকৃত সফলতা আত্মশুদ্ধির মধ্যেই নিহিত। আর আত্মশুদ্ধির অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো সহীহ দ্বীনি ইলম। কারণ মানুষ যখন আল্লাহর পরিচয়, তাঁর আদেশ-নিষেধ, জান্নাত-জাহান্নাম এবং আখিরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, তখন তার অন্তরে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

ُإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলিমগণই প্রকৃত অর্থে তাঁকে ভয় করে।”

(সূরা ফাতির : ২৮)

এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত ইলম মানুষের অন্তরে খাশিয়াত বা আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে। যে যত বেশি আল্লাহকে জানবে, সে তত বেশি তাঁর আনুগত্য করবে এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকবে। এভাবেই ইলম মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।

সালাফে সালেহীন ইলম অর্জনের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তারা মনে করতেন, ইলমের প্রকৃত ফল হলো আমল। তাই তারা যা শিখতেন তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেন। তাদের ইলম ছিল বিনয়, তাকওয়া, আন্তরিকতা এবং আল্লাহর ভয়ের মাধ্যমে অলংকৃত।

আত্মশুদ্ধির অন্যতম বাধা হলো অহংকার, হিংসা, রিয়া, লোভ, ক্রোধ এবং দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি। দ্বীনি ইলম এসব রোগের চিকিৎসা করে।

কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষ নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং আত্মসংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ফলে সে নিজের চরিত্রকে সুন্দর করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অগ্রসর হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ছিল ইলম ও তাযকিয়ার এক অনন্য সমন্বয়। তিনি শুধু মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দেননি; বরং তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছেন এবং উত্তম চরিত্র

গঠনে সহায়তা করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-এর অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন—

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"তিনি তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।"

(সূরা আল-বাকারা : **১২৯**)

এভাবেই ইলম মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মাধ্যম হয়ে ওঠে।বর্তমান যুগে অনেক সময় ইলমকে শুধু তথ্য সংগ্রহ বা বিতর্কের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়। অথচ প্রকৃত দ্বীনি ইলম মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন আনে, তার চরিত্রকে উন্নত করে এবং তাকে আল্লাহমুখী করে তোলে। তাই ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আত্মসংশোধন ও আত্মশুদ্ধি, কেবল জ্ঞান প্রদর্শন নয়।

নারী ও শিশুদের ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই ইলম অর্জনের গুরুত্ব রয়েছে। একজন শিক্ষিত মা পুরো পরিবারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই দ্বীনি শিক্ষা দিলে তাদের চরিত্র সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) নারী সাহাবিদেরও শিক্ষা দিতেন এবং তাদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করতেন। তাই নারী ও শিশুদের শিক্ষাকে অবহেলা করা ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক নয়।

শিক্ষা অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) জন্য ফরজ" (ইবনে মাজাহ)।
তাই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য নারীদের ইলমে দ্বীন শিক্ষার বিকল্প নেই।

ইলমে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১. ব্যক্তিগত ইবাদত ও আত্মশুদ্ধি:
একজন মুসলিম হিসেবে শুদ্ধভাবে পবিত্রতা অর্জন, নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য হুকুম-আহকাম পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নারীর ওপর ফরজ। দ্বীনি শিক্ষা ছাড়া নির্ভুলভাবে ইবাদত করা সম্ভব নয়।তাই একজন নারীকে তার আকীদা, ইবাদত, হালাল-হারাম এবং নৈতিক বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যাতে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারেন।ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং সেই অনুযায়ী আমল করা ও প্রত্যাহিক জীবনে প্রয়োগ করা। সেজন্য মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন সম্পর্কে প্রথমে জানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সঠিকভাবে আমল করতে হবে।

২. আদর্শ মা ও প্রথম শিক্ষক:

সন্তানের প্রথম পাঠশালা হলো তার মায়ের কোল। মা যদি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হন, তবেই তিনি সন্তানকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও উন্নত নৈতিকতায় গড়ে তুলতে পারেন। একটি শিক্ষিত মা মানেই একটি আদর্শ ও সভ্য প্রজন্ম। মা হলো সন্তানের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা। সন্তান জন্মের পর থেকে তার ভাষা, আচরণ, চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধ গঠনে মায়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি থাকে। একজন জ্ঞানী মা সন্তানের মধ্যে দ্বীন, নৈতিকতা ও মানবিকতার বীজ বপন করতে পারেন। প্রখ্যাত আলেম ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালী শিশুদের সঠিক লালন-পালনে পিতা-মাতার জ্ঞান ও সচেতনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাই নারীর ইলম অর্জন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।।

৩. আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠন:

পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি, আর পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হলো নারী। একজন শিক্ষিত ও দ্বীনদার নারী সন্তানদের সঠিক শিক্ষা, আদব-আখলাক ও ইসলামী মূল্যবোধ শেখাতে সক্ষম হন। শিশু তার জীবনের প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছ থেকেই লাভ করে। তাই নারীর ইলমী যোগ্যতা যত উন্নত হবে, পরবর্তী প্রজন্মও তত বেশি সুশিক্ষিত ও আদর্শবান হবে।পরিবারের শৃঙ্খলা রক্ষা, স্বামীর অধিকার ও সন্তানদের লালন-পালনে ইসলামের বিধান জানা থাকলে একটি সুখী পরিবার গঠন সহজ হয়। নারীরা যখন দ্বীনি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন, তখন পুরো সমাজে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

৪. বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষা:

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন মাধ্যমে ইসলামের নামে নানা ভুল তথ্য প্রচারিত হয়। সঠিক দ্বীনি জ্ঞান থাকলে নারীরা এসব বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার থেকে নিজেকে এবং পরিবারকে রক্ষা করতে পারেন।সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, কুসংস্কার ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মোকাবিলায় শিক্ষিত নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইলম একজন নারীকে সঠিক ও ভুলের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে এবং পরিবার ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার যোগ্যতা প্রদান করে। ফলে সমাজে ন্যায়, সততা ও শালীনতা প্রতিষ্ঠায় নারীরা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

৫. দাওয়াহ বা ইসলামের প্রচার:

নারীদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য নারী আলিম বা শিক্ষিত নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। অনেক ব্যক্তিগত ও স্পর্শকাতর মাসআলা থাকে যা নারীরা অন্য একজন নারীর কাছ থেকেই স্বাচ্ছন্দ্যে শিখতে পছন্দ করেন।ইসলামের ইতিহাসে বহু নারী হাদিস, ফিকহ ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। বিশেষভাবে আয়িশা (রা.) ছিলেন ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম প্রধান উৎস। অসংখ্য সাহাবি ও তাবেঈ তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে নারীর ইলম অর্জন ও তা প্রচার করা ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

ইসলাম নারী শিক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে,এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহের বহু স্থানে উল্লেখ হয়েছে।আল্লাহ তা'আলা
ইরশাদ করছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاس...ُ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং আপন পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও"। (সূরা-তাহরীম-৬)

উক্ত আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন পরিবারবর্গকে (মা-বোন ও সন্তান) কেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর কথা বলেছেন। আর বন্দেগীর জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। স্পষ্টতই নারীর দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম । কুরআনও যার ব্যাপারে অভিভাবকদের আদেশ করেছে। অনুরূপভাবে হাদিসের বহু স্থানে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة-

শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবীজী সা. আমার কাছে আসলেন, আর আমি তখন হাফসা রা. এর নিকটে ছিলাম।তিনি আমাকে বললেন, তুমি

তাকে যেভাবে লিপিবিদ্যা শিখিয়েছো সেভাবে খুঁজলি-পাচড়ার চিকিৎসার পদ্ধতিও কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না? (আবু দাউদ-৩৮৮৭) ।

উক্ত হাদিসে হযরত শিফাকে লক্ষ্য করে নবীজীর উক্তি " কেন শিখাচ্ছো না " থেকেই তাঁর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে। যিনি আল্লাহর রাসূল, তার সাধারণ কথাটা ভিন্নভাবে ব্যক্ত করা নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে। এ থেকে মহিলাদের লিপিবিদ্যায় দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব বুঝা যায়।

ইমাম শামছুল হক আযীমাবাদী রহ. নারীর লিপিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে

- عقود الجمان في جواز الكتابة للنسوان

নামক বিরাট একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা মাসআলাটির প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে। শুধু নববী তারগীব নয় বরং মহিলা সাহাবিয়াদের ইলম অর্জনের যে অফুরন্ত জযবা ছিল তাও পরিষ্কার হয় নিচের বর্ণনাটির মাধ্যমে; আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, সাহাবিয়াগণ দরবারে নববীতে পয়গাম পাঠালেন যে, আপনি পুরুষদেরকে দ্বীন শিখাচ্ছেন, আমরা নারীরাও ইলম অর্জনে আগ্রহী। তাঁদের শিখার আগ্রহ দেখে নবীজী (সা:) বাঁধা দেয়া তো দূরে থাক, সানন্দে রাজী হয়ে ওদের বাহবা দিয়ে বললেন, "তোমাদের পাঠদান হবে অমুক মহিলার ঘরে"। আর তিনি সেখানে মহিলা সাহবীদেরকে দ্বীনি ও জরুরী মহিলা বিষয়ক হুকুম-আহকাম শিখিয়েছেন।
অপর এক হাদিসে প্রিয়নবী সা. ইরশাদ করেন -

ثلاثة لهم اجران.... ورجل كانت عنده أمة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقهافتزوجها فله اجران

তিনি ব্যক্তির জন্য দিগুন সওয়াব রয়েছে। তন্মধ্যে একজন এমন ব্যক্তি যার নিকট একজন দাসী আছে। (যার সাথে সে মিলিত হয়।) সে তাকে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিখিয়েছে, ভালোভাবে দ্বীনি তা'লীম দিয়েছে। এবার তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে নিয়েছে। তার জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে।

হাদিস থেকে নারী শিক্ষার গুরুত্ব এভাবে বুঝে আসে যে, নবীজী সা. বাদীকে শিক্ষা দিয়ে তাকে আযাদ করে স্ত্রী বানিয়ে নেয়াতে দু'টো প্রতিদানের ঘোষণা দেন।

১. তাকে শিক্ষা দেয়াতে।

২. তাকে আযাদ করে স্ব-স্ত্রীত্বে বরণ করাতে।

বাঁদীকে আযাদ ও তাকে স্ত্রী বানানো অনেক বড় ধৈর্য্য ও সামাজিক পরিক্ষার ব্যাপার ছিল তৎকালীন সময়ে। অথচ এ শক্ত কাজের বিনিময়ে একটি প্রতিদান এবং শুধু নারীর শিক্ষার বিনিময়ে সম্পূর্ণ এক বিনিময় প্রদানের ঘোষণা করা নারীর শিক্ষার গুরুত্বারোপ বৈ কিছুই না।

প্রশ্ন আসে যে, পবিত্র কোরআনে–

ولهن مثل اللذي عليهن بالمعروف

"আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের প্রতি পুরুষের রয়েছে"।

এবং প্রসিদ্ধ হাদিস - النساء شقاءق الرجال

"নারীরা পুরুষের অনুরূপ "

। (তিরমিযী, হাদিস: ১১৩, ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৬১২)

এ- থেকে নারী-পুরুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা স্পষ্ট বুঝে আসা সত্ত্বেও হাদিসে বিশেষভাবে নারী শিক্ষার উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা কেন পড়লো? যদি এই হাদিস সমূহ না বলা হতো তবুও তো নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় শিক্ষিতা হওয়ায় ধর্মীয় বাধা ছিল না। হ্যাঁ সহশিক্ষা, শরীয়ত বিরোধী পরিবেশ, নারীর সুরক্ষার শতভাগ সুবিধা না থাকায় এবং বিশেষত জাগতিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রী বৈষম্যতার দরুণ বর্তমান ফিৎনার যুগে ইসলামী শরীয়ত সম্মত পন্থায় নারী শিক্ষায় বৈধতা দেয় এটা ভিন্ন কথা। এসব সমস্যা না থাকলে নারীর শিক্ষার উপর ধর্মীয় কোন বাধা-নিষেধ নেই। তবুও নবীজী সা. বিশেষভাবে তাকীদ করা এজন্য যে, তিনি হাদিস পাকে ইরশাদ করেন-

اوتيت علم الاولين والاخرين

" আমাকে পূর্বাপর সকলের জ্ঞান দেয়া হয়েছে।"

এর আলোকে স্বীয় ঐশী দূরদর্শিতার বলে তিনি বুঝেছিলেন, সুদূর ভবিষ্যতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব লোপ পাবে আর এ মহান অধিকার থেকে হয়তোবা তারা বঞ্চিত হবে, তাই তিনি তাদের কথা স্পষ্টত: উল্লেখ করে দিয়েছেন। নারী হলো শিশুর প্রথম বিদ্যালয় । বাচ্চা শৈশবের পুরো সময়টাই মায়ের সাথে কাঁটায়। এসময় মায়ের থেকে দেখে

সে যা শিখে তা তার কচিমনে পাথরের উপর খোদাই করা লিপির ন্যায় বদ্ধমূল হয়ে যায়।

প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার সূচনা তাই হয়, যা সে তার মায়ের কাছে থেকে শিখে। অতএব মা যদি নিজে শিক্ষিতা না হয়, ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করার জন্য ভালো-মন্দের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকে, তখন উপযোগী ও কাঙ্খিত তারবিয়াত না পাওয়ায় যে শূণ্যতা বাচ্চার জীবনে সৃষ্টি হয় তা অদূরণীয়। স্কুলে যেসব মিশ্র নৈতিকতার শিক্ষা সে মনে ধারণ করে তা তার অন্তরে বদ্ধমূল হতে যথেষ্ট সময় নেয়। অনেক বিষয়ের মধ্যে একটি ইসলাম শিক্ষা যা নৈতিকাতার পরিচায়ক, এটা তখন সে দীক্ষা হিসেবে নয়, পরিক্ষায় পাশের জন্য পড়া-শুনা করে। যে শিক্ষা ছোটকালে তার নিকট মুখ্য থাকার কথা, তা পরিক্ষার বিষয় হিসেবে আয়ত্ব করে সে, কাজেই মায়ের শিক্ষিত হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী, যেন সন্তানের সুষ্ঠভাবে বেড়ে উঠতে তার অবদান প্রকাশিত হয় এবং সন্তান সুনাগরিক হয়ে দেশ-সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে।

নারী সামাজে ইলম তলবের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা।
শিশুর হৃদয় সাদা কাগজের মতো নির্মল ও গ্রহণক্ষম। শৈশবে যে শিক্ষা ও আদর্শ তার অন্তরে বপন করা হয়, তা পরবর্তী জীবনে তার চরিত্র ও চিন্তাধারার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইসলামে শিশুদের দ্বীনি শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বীনি শিক্ষা শিশুকে আল্লাহর পরিচয়, রাসূল (সা.)-এর আদর্শ, আখিরাতের বিশ্বাস এবং ইসলামের মৌলিক আকীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রদান করে। ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালী তাঁর গ্রন্থ ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন-এ উল্লেখ করেছেন যে, শিশুদের অন্তর একটি মূল্যবান আমানত; তাকে সঠিকভাবে লালন-পালন করলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবে। তাই ঈমানভিত্তিক ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য শিশুদের দ্বীনি শিক্ষা অপরিহার্য।

উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা বিকাশে দ্বীনি শিক্ষা।

বর্তমান যুগে নৈতিক অবক্ষয়, মিথ্যাচার, প্রতারণা ও অশ্লীলতার ব্যাপক বিস্তার দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় শিশুদের চরিত্র রক্ষার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো দ্বীনি শিক্ষা। কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা শিশুদের মধ্যে সততা, আমানতদারি, বিনয়, ধৈর্য, সহনশীলতা ও মানবিকতা সৃষ্টি করে। বিখ্যাত আলেম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন, সন্তানের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর ন্যস্ত, আর অবহেলার কারণে অনেক সন্তান নৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বীনি শিক্ষা শিশুদের এমন নৈতিক শক্তি প্রদান করে যা তাদেরকে জীবনের বিভিন্ন প্রলোভন ও বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করে।

ইবাদতের অভ্যাস ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

দ্বীনি শিক্ষা শিশুদের ইবাদতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শেখায়। নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, যিকির ও অন্যান্য ইবাদতের শিক্ষা শৈশবেই প্রদান করা হলে তা ধীরে ধীরে তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত কেবল কিছু আনুষ্ঠানিক কাজের নাম নয়; বরং এটি মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যম। শিশু যখন ছোটবেলা থেকেই আল্লাহর স্মরণে অভ্যস্ত হয়, তখন তার অন্তরে তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির গুণ বিকশিত হয়। ফলে সে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে শেখে।

কু-সংস্কৃতি ও ভ্রান্ত মতাদর্শ থেকে সুরক্ষা।

আধুনিক প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের যুগে শিশুদের সামনে নানাবিধ চিন্তা, সংস্কৃতি ও মতাদর্শ প্রবেশ করছে। এর মধ্যে অনেক কিছু ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী। দ্বীনি শিক্ষা শিশুদের সঠিক ও ভুলের পার্থক্য নির্ণয় করার যোগ্যতা প্রদান করে। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো এমন মানুষ তৈরি করা, যারা আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে এবং ভ্রান্ত চিন্তার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। দ্বীনি শিক্ষার অভাবে শিশুরা সহজেই বিভিন্ন অপসংস্কৃতি ও বিভ্রান্তিকর মতবাদের শিকার হতে পারে।

পরিবার ও সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিক গঠন।

দ্বীনি শিক্ষা শিশুদের শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতই শেখায় না; বরং সামাজিক দায়িত্ববোধও সৃষ্টি করে। ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, প্রতিবেশীর হক আদায় এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করার শিক্ষা দেয়। ফলে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত শিশু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। তারা অন্যের অধিকার রক্ষা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এভাবে দ্বীনি শিক্ষা একটি শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণমুখী সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তাকওয়া ও আত্মনিয়ন্ত্রণের গুণাবলি সৃষ্টি।

মানুষের প্রকৃত সফলতা কেবল জ্ঞান অর্জনে নয়, বরং সেই জ্ঞান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার মধ্যে নিহিত। দ্বীনি শিক্ষা শিশুদের অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহভীতির গুণ সৃষ্টি করে। যখন একটি শিশু বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তার সব কাজ দেখছেন এবং একদিন তাকে এর হিসাব দিতে হবে, তখন সে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। ইসলামি শিক্ষাবিদ শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ শিক্ষা ও আদবের সমন্বয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত শিক্ষা সেই শিক্ষা যা মানুষের অন্তরে দায়িত্ববোধ ও আত্মসংযম সৃষ্টি করে।

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের উপায়।

দ্বীনি শিক্ষা কেবল আখিরাতের সফলতার জন্য নয়; বরং দুনিয়ার জীবনকেও সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে তোলে। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে শিশু সত্যবাদী, কর্মঠ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। ফলে সে শিক্ষা, কর্মজীবন এবং সামাজিক জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে। একই সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আখিরাতের মুক্তির পথও সুগম হয়। ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করতে চায়। দ্বীনি শিক্ষা সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাকে বুঝতে ও বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে।

ভবিষ্যৎ উম্মাহ ও সভ্যতা নির্মাণে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকা।

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার শিশুদের শিক্ষার ওপর। যদি শিশুদের দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যেতে পারে। পক্ষান্তরে, দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি প্রজন্ম ন্যায়, ইনসাফ, মানবতা ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে সমাজ গঠনে সক্ষম হয়। বিশিষ্ট দাঈ ও চিন্তাবিদ আবুল হাসান আলী নদভী মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য ইসলামী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, উম্মাহর ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য শিশুদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও দ্বীনি জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।শিশুদের দ্বীনি শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজন নয়; বরং একজন মুসলিম হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলতে দ্বীনি ইলম অর্জন করা অপরিহার্য।

ইলম হলো উত্তম জিহাদ

ইসলামে সত্য জ্ঞান প্রচার করা একটি বড় ইবাদত এবং উত্তম জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইলমের মাধ্যমে মানুষকে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা যায়। কলম ও জ্ঞানের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা করা ইসলামে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ।
দ্বীনি ইলম মানুষকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করে এবং সমাজে ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করে। তাই ইলম অর্জন ও প্রচার উম্মাহর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

জিহাদের একটি প্রকার হলো প্রমাণ ও দলীলের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা। দ্বীনের হেফাজতের জন্য এ জিহাদের বিকল্প নেই। এটিই নবীর উত্তরাধিকারী নেতৃবৃন্দের জিহাদ। মুখ ও হাতের জিহাদ থেকে এটির মর্যাদা মোটেও কম নয়। আর এই জিহাদের গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

"আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতাম। সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) কর।" (সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ৫১-৫২)
হযরত ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, এটি ছিল তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের সাহায্যে জিহাদ। জিহাদের প্রকারভেদের মধ্যে এটিই বড়।
এটাকে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও বলা হয়। কারণ মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো না, তারা দৃশ্যত মুসলিমদের সঙ্গেই থাকত। এমনকি কখনো তারা মুসলিমদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হতো। এতদাসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হোন; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।" (সূরা আত তাহরীম, আয়াত: ০৯)

বলা বাহুল্য মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় কুরআন ও প্রমাণের মাধ্যমে। সুতরাং এই জিহাদের মূল হাতিয়ার হল ইলম। এ জন্যেই তো ইলেম অন্বেষণকারী ও মুজাহিদকে এক কাতারে রাখা হয় এবং উভয়কে বলা হয় আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ। যেমন হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عن أبي هريرة: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتِهِ إلا لخيرٍ يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ (ইলেম) শেখার বা শেখানোর অভিপ্রায়ে আসবে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের মর্যাদার অধিকারী। আর যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের সম্পদ পরিদর্শনে আসে।
(ইবনে মাজাহ. হাদিস নং ২২৭) ।

ইসলামে "জিহাদ" বলতে শুধু যুদ্ধকে বোঝানো হয় না; বরং আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ চেষ্টা, সংগ্রাম ও ত্যাগকে জিহাদ বলা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীনি ইলম অর্জনকেও একটি বড় ও মর্যাদাপূর্ণ জিহাদ হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ ইলম অর্জনের পথে মানুষকে নিজের নফস, অলসতা, সময়, আরাম এবং দুনিয়াবি আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। একজন ত্বলিবুল ইলম যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান অর্জনে লেগে থাকে, তখন সে আসলে নিজের ভেতরের শত্রু—অজ্ঞতা, গাফিলতি এবং শয়তানের প্ররোচনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

ইলম অর্জন এমন একটি জিহাদ, যেখানে মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। কঠিন বিষয় বুঝতে কষ্ট হওয়া, বারবার ভুল হওয়া, সময়ের অভাব, কিংবা ক্লান্তি—এসব বাধা অতিক্রম করাই এই জিহাদের অংশ। যে ব্যক্তি এই কষ্টের মধ্যেও আল্লাহর জন্য ইলম অর্জন চালিয়ে যায়, তার এই

প্রচেষ্টা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কারণ সে নিজের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে আল্লাহর দ্বীনকে শেখার ও বোঝার জন্য সংগ্রাম করছে।

ইলম অর্জনের এই মহান জিহাদ মানুষকে ধীরে ধীরে ভেতর থেকে পরিবর্তন করে দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কষ্ট সহ্য করে জ্ঞান অর্জনের পথে অটল থাকে, তার অন্তরে আল্লাহ তাআলা এক বিশেষ নূর দান করেন, যা তাকে সঠিক ও ভুলের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে। এই নূরের মাধ্যমে তার চিন্তা-চেতনা পরিষ্কার হয়, আমল শুদ্ধ হয় এবং জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে সে হেদায়েতের আলো খুঁজে পায়। ফলে সে শুধু নিজের জন্য নয়, বরং অন্যদের জন্যও কল্যাণের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

দ্বীনি ইলম অর্জন অজ্ঞতা ও গাফিলতির বিরুদ্ধে লড়াই করে। অনেক সময় মানুষের মন চায় আরাম করতে, সময় নষ্ট করতে বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে, কিন্তু একজন প্রকৃত তালিবুল ইলম সেই প্রবৃত্তিকে দমন করে আল্লাহর জন্য জ্ঞান অর্জনে লেগে থাকে। এই সংগ্রাম সহজ নয়; বরং এটি একটি ধারাবাহিক ত্যাগ ও সাধনার পথ, যেখানে প্রতিদিন নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করতে হয়। এ কারণেই আলেমগণ বলেছেন, ইলম অর্জন হলো এমন এক জিহাদ যেখানে মানুষ নিজের নফসকে পরাজিত করে আল্লাহর পথে নিজেকে বিজয়ী করে তোলে।

ইলম শুধু ব্যক্তিগত উন্নতির মাধ্যম নয়, বরং এটি সমাজের অন্ধকার দূর করে হেদায়েতের আলো ছড়িয়ে দেয়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যখন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষকে শিক্ষা দেন, তখন তিনি সমাজ থেকে কুসংস্কার, ভুল বিশ্বাস এবং অজ্ঞতা দূর করেন। এই দাওয়াতি ও শিক্ষামূলক কাজও একটি মহান জিহাদ, কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে গোমরাহি থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা হয়। তাই ইলম অর্জন শুধু নিজের জন্য নয়, বরং পুরো উম্মাহর জন্য কল্যাণ বয়ে আনার একটি সংগ্রাম।

আল্লাহ তাআলা ইলম ও তার পথে চেষ্টা করার মর্যাদা সম্পর্কে বলেন—
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون

"আর মুমিনদের জন্য এটা সম্ভব নয় যে তারা সবাই একসাথে বের হয়ে যাবে। বরং প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ বের হয়ে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করবে, এবং ফিরে এসে তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করবে, যাতে তারা সাবধান হতে পারে।"
(সূরা আত-তাওবা: ৯:১২২)

সবশেষে বলা যায়, ইলম অর্জন হলো এমন এক সম্মানিত জিহাদ, যার ফল দুনিয়া ও আখিরাতে স্থায়ী সফলতা। এই পথে কষ্ট থাকলেও এর প্রতিদান অত্যন্ত মহান এবং চিরস্থায়ী। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত ইখলাসের সাথে এই পথে অগ্রসর হওয়া, ধৈর্য ও নিয়মিততার মাধ্যমে ইলম অর্জন করা এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করা, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতের পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়।